পঞ্চায়েত নির্বাচন
২০১৮

পশ্চিমবঙ্গ

ফেব্রুয়ারি-মে, ২০১৮

অপ্রতিহত উন্নয়ন

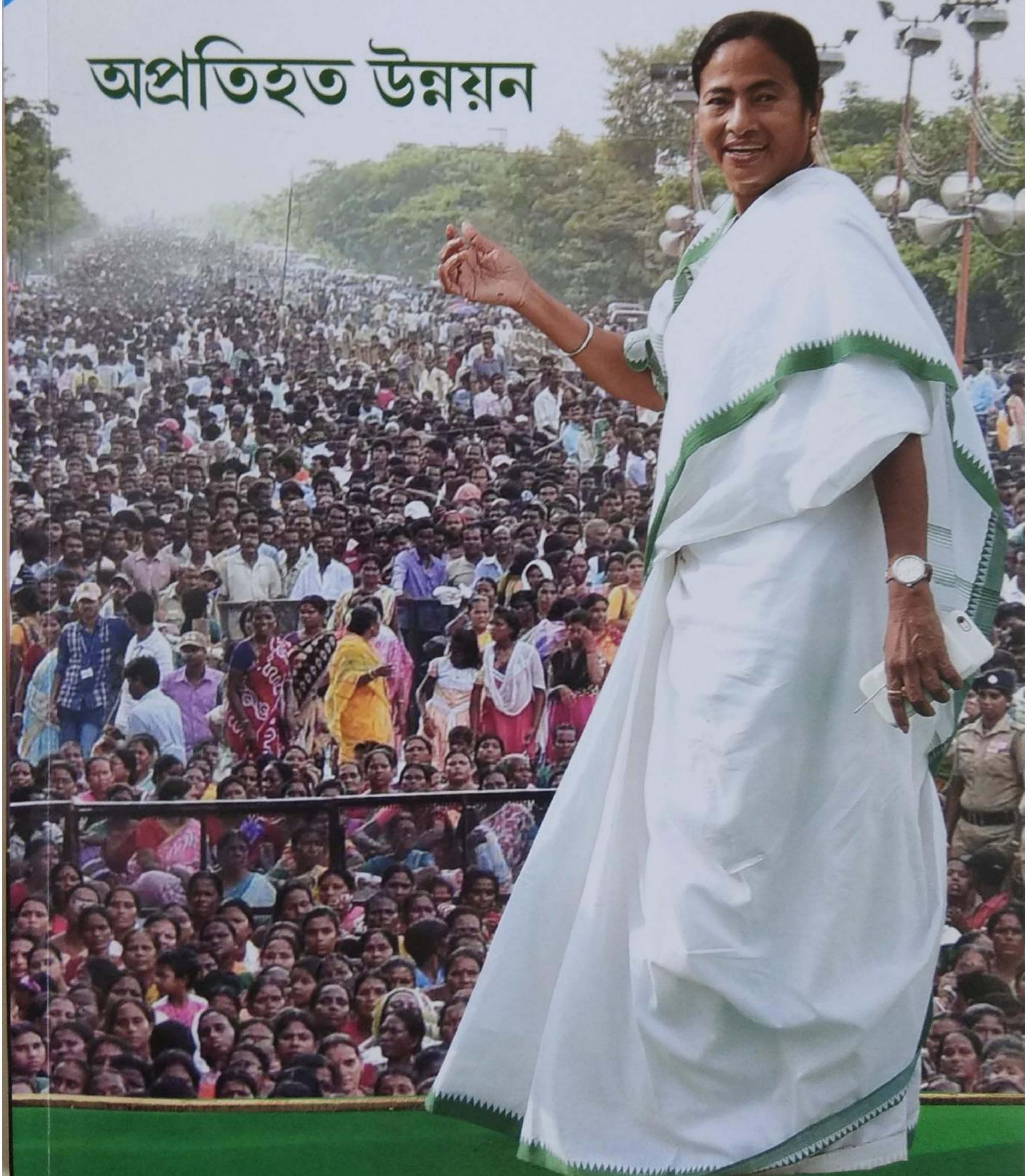

২৫ মে, ২০১৮। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশ ভবন' উদ্‌বোধন ও কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডিলিট গ্রহণ উপলক্ষে শেখ হাসিনার এই রাজ্যে আসা।

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের মুখপত্র
বর্ষ-৫০ সংখ্যা ১০-১২
বর্ষ-৫১ সংখ্যা ১
ফেব্রুয়ারি-মে ২০১৮
মূল্য : ৫০ টাকা

সূ • চি • প • ত্র

সম্পাদকীয় ৩

উন্নয়নের অভিমুখ ৪

২০১১। ২০১৩। ২০১৪। ২০১৬। ২০১৮। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। নেতৃত্বে অবশ্যই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবছরের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ফের প্রমাণ করল উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই মানুষের মন জয় করা যায়।

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার এই সংখ্যায় ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল-সহ কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হল।

অপ্রতিহত উন্নয়ন: পঞ্চায়েতে বিপুল জয় ৪

উন্নয়নেই হয় পঞ্চায়েতে জয় ৯
প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী

পরিবর্তন ও নবনির্মাণ ১৩

উন্নয়নে দিশা এবং দিশায় উন্নয়ন ২৮
দেবাশিস ভট্টাচার্য

সংবাদ শিরোনামে ৩৪

ফটোফিচার ৪০

উপদেষ্টা সম্পাদক প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী
প্রধান সম্পাদক আলোকোজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক সুপ্রিয়া রায়

সহ-সম্পাদক
রাতুল দত্ত সর্বাণী আচার্য

অলংকরণ সুরজিৎ পাল
প্রতিটি প্রচ্ছদের ছবি ও ভেতরের ছবি অশোক মজুমদার
বাকি ছবি তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত
প্রথম প্রচ্ছদ পরিচিতি **সিঙ্গুরে বিজয়োৎসবে মুখ্যমন্ত্রী**

সম্পাদকীয় শাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মহাকরণ (চতুর্থ তল), কলকাতা ৭০০ ০০১
দূরভাষ (০৩৩) ২২৫৪ ৫০৮৬ ই-মেল : editbengali@gmail.com
বিতরণ শাখা, ১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০, দূরভাষ (০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধিগৃহীত একটি সংস্থা) ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত

ফিরে দেখা ৫৮

টাইম পত্রিকায় সেরা ১০০
প্রভাবশালীর তালিকায় মুখ্যমন্ত্রী ৫৮

কলকাতায় হিলারি ক্লিন্টন
সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ৫৯

দপ্তর কথা ৬০

২০১৩-র পর ২০১৮। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপুল জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। দলের নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন থেকে রাজ্যের দায়িত্ব নিয়েছেন, উন্নয়নের ধারাকে বাংলার প্রতিটি প্রান্তিক গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছেন। প্রতিটি দপ্তরের সচিবদের নিয়ে জেলাস্তরে বৈঠক করেছেন। তাই এই জয় উন্নয়নের। কয়েকটি দপ্তরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরা হল এই প্রতিবেদনগুলিতে।

প্রশাসনিক সংস্কার ৬১

শিল্প ও বাণিজ্য
শিল্পায়নের বার্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ৪ বিদেশ সফর ৬৪
বিশ্ববাংলায় বাণিজ্য সম্মেলন ৭০

পাহাড় ও উত্তরবঙ্গ
পাহাড়ে আজ শান্তির আবহ (লক্ষ্য : উন্নয়ন আর কর্মসংস্থান) ৭৮

জঙ্গলমহল
ধাপে ধাপে উন্নয়নের পথে জঙ্গলমহল ৮৮

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
নিখরচায় সেরা পরিষেবা, সরকারি হাসপাতালে মানুষের ঢল ৯২

শিক্ষা
নতুন সিলেবাস, শিক্ষার্থীদের হাতে নয়া হাতিয়ার রাজ্যের ১০১
কন্যাশ্রী থেকে নতুন ব্যাগ, জুতো
মুখ্যমন্ত্রীর উপহার হাতে নিয়ে স্কুলের পথে হাসির কলরোল ১০৭

তপশিলি জাতি, আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণি
অনলাইনে জাতিগত শংসাপত্র প্রদান ১১২

পরিবহণ
গতির ডানায় ভর করে এগিয়ে চলেছে 'বিশ্ববাংলা' ১২১

নগরোন্নয়ন
শহর ও প্রকৃতির মেলবন্ধন, স্বপ্নের নয়া ঠিকানা নিউটাউন ১২৬

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগ
কৃতী-স্বীকৃতি-সম্মাননা ১৪২

উন্নয়নেই সম্ভব নির্বাচনে জয়

গত সাত বছরে প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নয়নের পদচারণা সামগ্রিকভাবে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সর্বভারতীয় স্তরে পশ্চিমবঙ্গ অনেকগুলি ক্ষেত্রেই প্রথম স্থানে পৌঁছতে পেরেছে আজ। নিরলস প্রয়াসই শুধু নয়, ভাবনার অভিনবত্ব ও তার প্রয়োগকুশলতাই প্রাধান্য পাচ্ছে এইসব ক্ষেত্রে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উঠছে মডেল। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও। যেমন 'কন্যাশ্রী'। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম মূল বিন্দু-নারী। যথাযথভাবে তাকে গড়ে তোলার মধ্যেই উন্নয়নের আসল কথা লুকিয়ে আছে। অন্যদিকে কৃষিভিত্তিক বাংলায় কৃষিকেই দেওয়া হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্ব। তাই খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনই নয়, অন্যকেও খাদ্য জোগাতে আজ এগিয়ে চলেছে এই রাজ্য। কৃষি-সাফল্যের হাত ধরেই বাংলার জীবনস্পন্দন অন্য সুরে বইতে শুরু করেছে। কৃষকের আয় বেড়েছে তিনগুণেরও বেশি। বাংলা আবার কৃষি-সমৃদ্ধ বাংলা হয়ে উঠেছে। এই সুফলা বাংলা-ই পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক বিকাশের পথকে সুগম করছে। শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ তার নিজস্ব ধারায় সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। বাংলার উৎসব-ঐতিহ্যের পরম্পরায় বর্ণময় হয়ে উঠেছে বাংলার মানুষের জীবনযাত্রা। তাই দেখি, উন্নয়নের ধারাকে আরও গতি দিতে সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে সরকারের প্রতি আবারও সমর্থন অর্পিত হয়েছে।

প্রান্তে প্রান্তে উন্নয়নকে ছড়িয়ে দিতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধভাবেই কাজ করে চলেছে।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধে লেখকের মতামত নিজস্ব। যে কোনও ত্রুটির জন্য মার্জনা চাইছি।

অপ্রতিহত উন্নয়ন : পঞ্চায়েতে বিপুল জয়

উন্নয়নের কোনও বিকল্প হয় না। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করার মধ্যেই সাফল্যের বীজ পোঁতা হয়। পশ্চিমবঙ্গ-এ সেটাই হয়েছে।

উন্নয়ন রূপায়িত হয়েছে মানুষের চাহিদা পূরণে।

মাত্র সাত বছরে রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের জন্য নানা স্তরে উন্নয়নের কাজ হয়েছে। গ্রাম এবং শহর উন্নয়নের ছন্দে একই সঙ্গে বাধা পড়েছে। দুই-এর মধ্যে দূরত্ব ঘুচেছে। এরই ফল মিলেছে পঞ্চায়েতের নির্বাচনের ফলাফলে।

অন্ধকার থেকে আলোয় যাওয়ার স্বপ্ন মানুষের চিরন্তন। অন্ধকারে-ডুবে-থাকা গ্রামগুলো আজ আলোয় ভরা। পাকা বা ঢালাই রাস্তা। সবার ঘরে আলো। বিশুদ্ধ পানীয় জলের পাশাপাশি জলতীর্থ। গ্রামে গ্রামে শিক্ষার প্রসার। স্কুলছুট ছেলেমেয়েদের জন্য হাতে-কলমে কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা যেন নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করে চলছে কত না কাজ। কাজের ছন্দে জেগে উঠেছে গ্রাম-বাংলা।

বাংলার কৃষি-সংস্কৃতির মূলক্ষেত্র গ্রাম-বাংলা জুড়ে। প্রায় ৭০% মানুষ আজও কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত। বাংলা আজও কৃষিভিত্তিক। এই কৃষিভিত্তিক বাংলা সমগ্র ভারতকে চমকে দিয়েছে। মাত্র সাতবছরে কৃষকের গড় বার্ষিক আয় বেড়েছে তিনগুণেরও বেশি। কৃষকের আয় বাড়া মানেই গ্রামে গ্রামে উন্নয়নের জোয়ার আসা। একদিকে নানা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা, অন্যদিকে ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি—দুইয়ে মিলে গ্রামের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

বাংলার গ্রাম-সমাজের এই যে ভিতর থেকে পরিবর্তন, তার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে মানুষের মধ্যে। গ্রামের উন্নয়নই সরকারের পাখির চোখ। শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। হাতে হাতে স্মার্ট ফোন। ঘরে ঘরে আলো আর টিভি। প্রতিদিন একটু একটু করে পর্দা খুলে যাচ্ছে তাঁদের। নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য তাঁরা মরিয়া।

শুধু যে গ্রামের মানুষের উন্নয়ন হচ্ছে তাই নয়, উন্নয়নের কারিগর তাঁরা নিজেরাই। সেকারণেই যতদিন যাচ্ছে পাই-পয়সার হিসেব-নিকেশ নিয়েও তাঁরা চোখে-কান খোলা রাখছেন। গ্রাম জেগে উঠেছে। আসল কথাটা এইখানে।

রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে যেখানে পিছিয়ে পড়া মানুষের বাস সেখানেও 'উন্নয়ন'-ই প্রাধান্য পেয়েছে পঞ্চায়েত গঠনের মতামতে।

জঙ্গলমহলের মতো অঞ্চলে মানুষ শান্তিতে বাস করছেন। তাঁদের প্রতিদিনের জীবন চলছে গড়গড়িয়ে।

তরতরিয়ে নির্বিঘ্নে সেখানে মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। উন্নয়নকে ঠেকিয়ে দিতে যাঁরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁদের প্রতিহত করে শান্তিপ্রিয় সৎ মানুষেরা 'উন্নয়ন'-কে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তাঁদের মরিয়া প্রয়াস প্রমাণ করল যে এই রাজ্যে উন্নয়নকে কোনওভাবেই ব্যাহত করা যাবে না।

গত সাত বছর ধরে রাজ্যে ধীরে ধীরে যে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, তার ফলেই সম্ভব হচ্ছে উন্নয়নের পথকে মসৃণ রাখা। আর্থিক সংকট রাজ্যের প্রধান সমস্যা। তবু তার মধ্যেই সমন্বয়ের মাধ্যমে জনকল্যাণকর নানা কর্মসূচির সঠিক রূপায়ণের ফলে মানুষের জীবনযাপনের মান উন্নত হয়েছে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই গরিব মানুষদের যে পরিষেবা দিচ্ছে এই রাজ্যের সরকার, বিগত সরকারের আমলে সেইসব পরিষেবা নিয়ে কারো কোনও হেলদোল ছিল না। এই সাত বছরে জনকল্যাণের ভাবনায় এই যে মহৎ কাজ হচ্ছে সমালোচকরাও এক্ষেত্রে প্রশংসা করতে বাধ্য হচ্ছেন।

সূর্যাস্তের পর স্তব্ধ হয়ে যেত বাংলার গ্রামের জীবন। আজ তা পাল্টে গিয়েছে। পথে পথে আলো। বাড়িতে বাড়িতে আলো। সন্ধ্যার পর 'কন্যাশ্রী'রা 'সবুজসাথী' নিয়ে পড়াশুনা করে ফিরছে বাড়িতে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী, আনন্দধারা, মুক্তিধারার মহিলারা কাজকর্ম করে ঘরে ফিরছেন রাতে। ঘরে ঘরে আলো জ্বেলে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করছেন গভীর রাত পর্যন্ত। বাড়ির বড়োরা ছোটখাটো যন্ত্রে কত রকম কাজই না করছেন। অবসর সময়টা আর নষ্ট হচ্ছে না। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ এসে পাল্টে দিয়েছে জীবনের অভ্যাস।

ছোটো ছোটো শিল্প কলকারখানা যেমন হচ্ছে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ফলে, তেমনি অনেক কাজেই ছোট্ট একটা যন্ত্র ব্যবহার করে একাই কাজ করে ফেলতে পারছেন একজন শ্রমিক। লোহার রড কাটা, কাঠ চেরাই, জমিতে জল দেওয়া—অন্যের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না।

গ্রামাঞ্চলে ১০০% বিদ্যুৎ গ্রামবাংলাকে আরও কর্মমুখর করে তুলেছে। কাজ মানেই আয়। আয় মানেই একটু ভাল খাওয়া, ভাল থাকা। আর এই খাওয়া-পড়ার পরেই আসে একটু মনে মনে খুশি থাকার ইচ্ছে। উৎসব আর গান-বাজনায় নিজেদের ভরিয়ে রাখা।

বাংলার গ্রাম-জীবন জুড়ে লোকসংস্কৃতির নানা পসরা। মানব-ঐতিহ্যের এক শক্তিমান ধারা এই বাংলার জীবনস্রোতকে শক্তি জুগিয়ে চলেছে। এখানেই বাংলার চিরায়ত সাধনা মুক্তি খুঁজে পায়।

নতুন সরকার বাংলার মৃতপ্রায় লোকসংস্কৃতিকে আবার বাঁচিয়ে তুলেছে। বিভিন্ন জনজাতির মানুষ তাঁদের নিজস্ব লোকসংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। উত্তরের পাহাড়ি এলাকা, তরাই-ডুয়ার্স, পশ্চিমের রূঢ় রুক্ষ লালমাটির এলাকা (জঙ্গলমহল), সুন্দরবনের জলা-জঙ্গল, অবশিষ্ট সমতল অঞ্চলে ছড়ানো ছিটানো আদিবাসী মানুষদের সংস্কৃতি পাচ্ছে নতুন করে স্বীকৃতি, সহায়তা, চর্চার পরিবেশ।

বাংলার গ্রামজীবন এভাবেই স্বস্তি খুঁজে পাচ্ছে।

তারই প্রতিফলন পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৮

যেক'টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

জেলা পরিষদ

জেলা/ব্লক	মোট আসন	যেক'টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে					
		এআইটিসি (AITC)	বিজেপি (BJP)	আইএনসি (INC)	এআইএফবি (AIFB)	আইএনডি (IND)	মোট
কোচবিহার	৩৩	৩১				১	৩২
জলপাইগুড়ি	১৯	১৯					১৯
উত্তর দিনাজপুর	২৬	২১	১		১		২৩
দক্ষিণ দিনাজপুর	১৮	১৮					১৮
মালদা	৩৮	২৯	৬	২			৩৭
মুর্শিদাবাদ	৭০	২১		১			২২
নদিয়া	৪৭	৪২	২				৪৪
উত্তর ২৪-পরগনা	৫৭	৪৮					৪৮
দক্ষিণ ২৪-পরগনা	৮১	৫৩					৫৩
হাওড়া	৪০	৩৯				১	৪০
হুগলি	৫০	৩৭					৩৭
পূর্ব মেদিনীপুর	৬০	৫৩					৫৩
পশ্চিম মেদিনীপুর	৫১	৫১					৫১
পুরুলিয়া	৩৮	২৬	৯	৩			৩৮
বাঁকুড়া	৪৬	১৫					১৫
পূর্ব বর্ধমান	৫৮	৪১					৪১
বীরভূম	৪২	০					০
আলিপুরদুয়ার	১৮	১৭	১				১৮
ঝাড়গ্রাম	১৬	১৩	৩				১৬
পশ্চিম বর্ধমান	১৭	১৬					১৬
মোট	৮২৫	৫৯০	২২	৬	১	২	৬২১

পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৮

যেক'টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পঞ্চায়েত সমিতি

জেলা	মোট আসন	যেক'টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে									
		এআইটিসি (AITC)	বিজেপি (BJP)	সিপিআই (CPI)	সিপিআইএম (CPIM)	আইএনসি (INC)	এআইএফবি (AIFB)	আরএসপি (RSP)	অন্যান্য (OTHERS)	আইএনডি (IND)	মোট
কোচবিহার	৩৬৬	২২৭	১১		১		১			২১	২৬১
জলপাইগুড়ি	২৩৪	১৭৬	৩৮		১	১					২১৬
উত্তর দিনাজপুর	২৮৭	১৮৯	৫৫		১০	৬	৫			১৪	২৭৯
দক্ষিণ দিনাজপুর	১৮৭	১৪০	৩৪		১			৩		১	১৭৯
মালদা	৪২৩	২৪৬	৯৭	১	৮	৫৫				৯	৪১৬
মুর্শিদাবাদ	৭৩৬	২২০	১২		৩	২২		১		৬	২৬৪
নদিয়া	৫৪১	৩৭০	৬৪		১৮	৫				৩	৪৬০
উত্তর ২৪-পরগনা	৫৮৯	৩৯১	২৪		৫	২	১			২	৪২৫
দক্ষিণ ২৪-পরগনা	৯১৩	৫০৪	৩৭		১৭	৫			৭	৯	৫৭৯
হাওড়া	৪৬২	৩১১	২৫		১		২			৪	৩৪৩
হুগলি	৬০৭	৩৩২	৬		৪					৪	৩৪৬
পূর্ব মেদিনীপুর	৬৬১	৪৯৭	৫		৬	৩				৩	৫১৪
পশ্চিম মেদিনীপুর	৬১১	৪২১	৪৫		৬					১৫	৪৮৭
পুরুলিয়া	৪৪৬	২৩৪	১৪২		২১	৩৩	৪		২	৫	৪৪১
বাঁকুড়া	৫৩৫	১৫৩	৩৩		৩					৫	১৯৪
পূর্ব বর্ধমান	৬১৮	২১৩	৩		১					৫	২২২
বীরভূম	৪৬৫	৫১	৮		১						৬০
আলিপুরদুয়ার	১৮৮	১২২	৫৬		১	১		১			১৮১
ঝাড়গ্রাম	১৮৭	১১২	৬৫		২					৬	১৮৫
পশ্চিম বর্ধমান	১৬১	৬৫		১							৬৬
মোট	৯২১৭	৪৯৭৪	৭৬০	১	১১১	১৩৩	১৩	৫	৯	১১২	৬১১৮

পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৮

যেক'টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

গ্রাম পঞ্চায়েত

জেলা/ব্লক	মোট আসন	যেক'টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে									
		এআইটিসি (AITC)	বিজেপি (BJP)	সিপিআই (CPI)	সিপিআই(এম) (CPIM)	আইএনসি (INC)	এআইএফবি (AIFB)	আরএসপি (RSP)	অন্যান্য (OTHERS)	আইএনডি (IND)	মোট
কোচবিহার	১৯৬৬	১০৫১	১১৬		৩	৭	৮			১১০	১২৯৫
জলপাইগুড়ি	১৩৪৭	৮০৬	৩০৮	১	৫১	২১	৪	২	৩	৩৫	১২৩১
উত্তর দিনাজপুর	১৬৪৯	৭৮৬	৩৮২	৩	১০১	৮৩	৪৪	৩	২	১৫৯	১৫৬৩
দক্ষিণ দিনাজপুর	৯৭৫	৫৪৬	২৩৬	১	৪৮	১৯		৪৫	১	২৪	৯২০
মালদা	২২৮১	১০৫৮	৫৩২	১	১১৪	৩৯৯		৭		১১৯	২২৩০
মুর্শিদাবাদ	৪১৭১	১০৪৫	১২৪		৬৪	১৮৬		১৪	১	৫৭	১৪৯১
নদিয়া	৩২০৯	১৬৪১	৬৪৭		১৭৯	৫৯	১	২	৬	১৫৩	২৬৮৮
উত্তর ২৪-পরগনা	৩৫৬০	১৯৭১	৩২৮	২	৮৯	৪১	৬			১৩৬	২৫৭৩
দক্ষিণ ২৪-পরগনা	৪৮৮৩	২১৩৭	৪১৭		১৬৫	৩৪	১	৮	৭৭	২১৬	৩০৫৫
হাওড়া	২৪৩১	১৪০৪	২৯৩	২	৫১	১১	৩			৪৭	১৮১১
হুগলি	৩১৯২	১৪১৩	১৬৭	১	১১৫	১২	১			১২৪	১৮৩৩
পূর্ব মেদিনীপুর	৩৩৭৮	২০৩৯	১৮৯	১৪	১৩৫	১৬		১	৩	১৮৯	২৫৮৬
পশ্চিম মেদিনীপুর	৩০৪০	১৫৪৯	৪১৭	৬	৮৮	৪			২	১৫৮	২২২৪
পুরুলিয়া	১৯৪৪	৮৩৯	৬৪৫	১	১৫৫	১৫০	২৪		৬	১০০	১৯২০
বাঁকুড়া	২৫০৫	৫৪৫	২৩৪		৫৯	১	১	১	১	৭০	৯১২
পূর্ব বর্ধমান	৩২৩৪	১০৪০	২৯		১৪	৩				৪৭	১১৩৩
বীরভূম	২২৪৭	২০৫	৬৩		৫	১	১			৪	২৭৯
আলিপুরদুয়ার	৯৯৯	৫৪৮	৩০৭		২৬	১৭		১৭	১	৩৭	৯৫৩
ঝাড়গ্রাম	৮০৬	৩৭৩	৩২৯	১	১৩					৬৩	৭৭৯
পশ্চিম বর্ধমান	৮৩৩	২৭৩	১৩	১	১১	১				২	৩০১
মোট	৪৮৬৫০	২১২৬৯	৫৭৭৬	৩৪	১৪৮৬	১০৬৫	৯৪	১০০	১০৩	১৮৫০	৩১৭৭৭

সূত্র: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট। ১ জুন ২০১৮

AITC – সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস
BJP – ভারতীয় জনতা পার্টি
INC – ভারতীয় জনতা কংগ্রেস
AIFB – সর্বভারতীয় ফরওয়ার্ড ব্লক
IND – নির্দল
CPI – কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া
CPI(M) – কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট)
RSP – রিভলিউশনারি সোসালিস্ট পার্টি
OTHER – অন্যান্য

উন্নয়নেই হয় পঞ্চায়েতে জয়

প্রদীপকুমার চক্রবর্তী

বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামের ইন্দ্রজাল অটুট। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্ব তত্ত্বাবধানে ঘটে চলা উন্নয়নের মঞ্চকে সম্বল করে বিরোধীদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভ করল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস।

বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের তুলনায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত—এই তিনটি স্তরের আরও অনেক বেশি আসন পেয়ে অভূতপূর্ব জয়লাভ করেছে।

১৪ মে-তে হয়ে যাওয়া এই পঞ্চায়েত নির্বাচন আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে যাকে সমগ্র বাংলা-জুড়ে শেষ নির্বাচনী প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা যেতে পারে, তা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী, ১৭ মে-র সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের জানান, বিরোধী ঐক্য এবং প্রচুর অপপ্রচার থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ আসন দখল করেছে। তিনি বলেন, 'এই ফলাফল প্রমাণ করছে মানুষ ও গণতন্ত্রের জয়। এটা মা-মাটি-মানুষেরও জয়।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই অভূতপূর্ব জয়-মানুষের সমর্থন ছাড়া অসম্ভব... যুক্তির খাতিরে বলা যায়, আমি স্বীকার করছি যে, ৯ যদি বা ১০ হতে পারে, কিন্তু শূন্য কখনও ১০ হয় না।

তিনি বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে এই বিরোধিতা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক আসনে জিতেছি। নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত আমি একটিও কথা বলিনি। কিন্তু আজ আমি প্রত্যেককে প্রশ্ন করছি কেন আমরা এইভাবে অপমানিত হলাম? মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। ফলাফল শুধুমাত্র পুনরায় প্রমাণ করেছে যে সাত বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর মানুষের বিশ্বাস একটুও সরেনি।

৬২১টি জেলা পরিষদ, ৬১১৮টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৩১,৭৭৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে নির্বাচন হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। জেলা পরিষদে মোট প্রতিদ্বন্দ্বী আসনের মধ্যে ৯৫%, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৮১.৩% এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬৬.৯৩% আসনে জয়ী হয়ে হয়েছে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে যথাক্রমে ৫৯০, ৪৯৭৪ এবং ২১,২৬৯টি আসনে জিতেছে।

ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তৃণমূল কংগ্রেস জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, হুগলি পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর-এর জেলা পরিষদের সবকটি আসন দখল করেছে।

বিজেপি অনেক কম আসন দখল করে দ্বিতীয় স্থানে আছে। জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি যথাক্রমে ৩.৫%, ১২.১৭% ও ১৮.১৭% আসন পেয়েছে।

জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে তাদের আসন সংখ্যা যথাক্রমে ২২টি, ৭৬০টি এবং ৫,৭৭৬টি।

তৃণমূল কংগ্রেসের এই উল্লেখযোগ্য জয় দেখিয়ে দিল যে বাংলায় বামেদের পুনর্জাগরণ আজও প্রায় অসম্ভব।

পাঁচ বছর আগে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে বামফ্রন্ট সব মিলিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল এবার গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে তৃতীয় স্থানে থাকলেও পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের স্তরে দুটিতেই চতুর্থ স্থানে চলে গিয়েছে।

বামফ্রন্টের প্রধান দল সিপিআই(এম) জেলা পরিষদে কোনও আসন পায়নি, সহযোগী দল ফরওয়ার্ড ব্লক জেলা পরিষদের একটি আসনে জিতেছে।

পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট যথাক্রমে ২.১২% এবং ৫.৩৯% আসনে জয়ী হয়েছে। জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে যথাক্রমে ১টি আসন, ১৩০টি আসনে এবং ১৭১৪টি আসনে জয়ী হয়েছে। যার মধ্যে ১৪৮৬টি আসনে জিতেছে সিপিআই(এম)। জেলা পরিষদ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে বামফ্রন্টের থেকে বেশি আসন পেয়েছে নির্দল, প্রার্থীরা।

২টি জেলা পরিষদ, ১১২টি পঞ্চায়েত সমিতি, ১৮৫০টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে জিতেছে নির্দল প্রার্থীরা যেখানে ৯টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ১০৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে জিতেছে অন্যদলের প্রার্থীরা।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ফলও শোচনীয়। মাত্র এক হাজারের কিছু বেশি আসনে জয়লাভ করে তারা গ্রাম পঞ্চায়েতে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। একইসঙ্গে জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিতে আসন সংখ্যার নিরীখে তারা তৃতীয় স্থানে আছে। উত্তর দিনাজপুর, মালদা এবং মুর্শিদাবাদে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তারা বেশ কয়েকটি আসন জিতেছিল, সেখানে এই তিন জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস এবার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে উঠে এসেছে।

মুর্শিদাবাদ, যা ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত কংগ্রেসের শক্ত খুঁটি হিসেবে দাবি করত, সেখানেও তৃণমূল কংগ্রেস, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর পার্টিকে তাঁর নিজের জেলার ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে মুছে দিচ্ছে। এই জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনে ১৪৯১টির মধ্যে ১০৪৫টিতে জিতেছে তৃণমূল। সেখানে মাত্র ১৮৬টি আসনে কংগ্রেস তাদের অস্তিত্ব জানান দিয়েছে।

২০১৩-র নির্বাচনে জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুরে বামফ্রন্ট জিতেছিল। মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলা পরিষদ দখল করে কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেস ১৭টির মধ্যে ১৩টি জেলা পরিষদে জিতেছিল গত নির্বাচনে।

এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে, কংগ্রেস জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে যথাক্রমে ০.৯৭%, ২.১৭% এবং ৩.৫৫% আসন জিতেছে।

কংগ্রেস ৬টি জেলা পরিষদের আসন, ১৩৩টি পঞ্চায়েত সমিতির আসন এবং ১০৬৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনে জিতেছে।

শাসক তৃণমূল কংগ্রেস, ৪৮৬৫০টির মধ্যে ১৬৮৭৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে, পঞ্চায়েত সমিতির ৯২১৭টি আসনের মধ্যে ৩০৯৯টিতে এবং ৮২৫টি জেলা পরিষদ আসনের মধ্যে ২০৪টিতে আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছে। তবে এইসব আসনের চূড়ান্ত ফলাফল মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারের ওপর নির্ভর করছে।

সব বাধার সম্মুখীন হয়েও, মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়ন কর্মসূচিকেই তুলে ধরছেন। বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর থেকেই তিনি গ্রামবাংলা গড়ে তোলাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। গত সাত বছরে মমতা ব্যানার্জী ব্যাপকভাবে বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেরিয়েছেন, নিজে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প

রূপায়ণের কাজ তদারকি করেছেন এবং স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে জনসংযোগ তৈরি করেছেন।

২০১৬ সালের মে মাসে দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি বলেন যে এবার সরকার মনোযোগ দেবে যুবসম্প্রদায়ের ওপর, আরও বেশি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে এবং সকলের জীবনের গুণগত মানের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো হবে।

দ্বিতীয় দফায় তাঁর অঙ্গীকার এবং আন্তরিক প্রয়াস ছিল আরও গতিতে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আগের সরকারের বিশাল ঋণের বোঝা সত্ত্বেও তাঁর সরকার সমাজের সব আগের শ্রেণির মানুষের জন্যই উন্নয়ন কর্মসূচি বানিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান তৈরিতে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে উঠে এসেছে। ২০১৮-র ৩১ মার্চ পর্যন্ত হিসাবের নিরিখে ১০০ দিনের কাজে রাজ্য ৩০.৯৮ কোটি শ্রমদিবস তৈরি করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। মমতা ব্যানার্জী গত ৩ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে একটি ফেসবুক পোস্টে একথা জানিয়েছেন। আরও বলা যায়, এই কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ৮০০৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যেটিও দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণের। গত সাত বছরে তিনি ৪০০টি প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে এবং সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। উন্নয়ন কর্মসূচির কাজের হিসাব নেওয়ার পাশাপাশি জনগণকে পরিষেবা প্রদান সময়মতো হচ্ছে কিনা তা তদারকি করার জন্য তিনি ব্লক স্তর থেকে রাজ্য সচিবালয়ের আধিকারিকদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন। জেলাগুলিতে একের পর এক জনকল্যাণ প্রকল্প রূপায়ণের কাজ চলছে যেগুলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত, যেমন রাস্তার সংযোগ, স্বাস্থ্যপরিষেবা, পানীয় জল, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, স্বনিযুক্তি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এবং এর ফলে সার্বিক উন্নয়নে জোয়ার এসেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প কন্যাশ্রী সবচেয়ে বড়ো আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রকল্প যা প্রায় ৫০ লক্ষ ছাত্রীকে উপকৃত করেছে। সবুজসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে ৭০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়ার ফলে গ্রামবাংলায় স্কুল-ছুটের সংখ্যা অনেক কমেছে।

ব্যাপকভাবে উন্নত হয়েছে গ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জলের সুবিধা, বিদ্যুৎ, বাড়িতে বাড়িতে নলবাহিত জল, বাড়ি নির্মাণের জন্য গরিবদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে টাকা, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং অন্যান্য কল্যাণজনক সুযোগসুবিধা গ্রামীণ মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে।

গ্রামের মানুষের কাছে কর্দমাক্ত পথ এখন অতীতের দুঃস্বপ্ন মাত্র।

পরিবর্তন ও নবনির্মাণ

পরিবর্তনের দুটি রূপ—একটি সকলের খোলা চোখে ধরা পড়ে, অন্যটি কারও কারও মনের চোখে ধরা পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন এসেছে, দুই রূপেই। উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে 'পরিবর্তন'-র রূপ দৃশ্যগ্রাহ্য এবং আপাত-দৃশ্যগ্রাহ্য নয়।

১৯৭৭ থেকে ২০১১-এর মে, দীর্ঘসময় বাম-আদর্শ নিয়ে সরকার পরিচালিত হয়েছিল এই রাজ্যে। বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেও রাজ্যের হাল হয়ে উঠেছিল শোচনীয়।

রাজ্যের এক বিস্তৃত অঞ্চলের মানুষ অনাহারে হয়ে পড়েছিল মৃতপ্রায়। দু-একটি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে যা রাজ্যবাসীর কাছে লজ্জার।

এমন ঘটনা কোনওভাবেই অভিপ্রেত নয় কখনওই। বিশ্বের মানুষ নজর রাখতে শুরু করল এই রাজ্যের উপর।

এই রাজ্যের মানুষ শুধু দেশভাগ নয়, অবিভক্ত বাংলা ভাগেরও শিকার। এবং তা ধর্মের ভিত্তিতে। ভাঙা মন নিয়ে, বাস্তু ছেড়ে ওপার বাংলার মানুষ এপার বাংলায় এসেছে আশ্রয়ের সন্ধানে। সময় লেগেছে দুই বাংলার মিলে যেতে।

ধর্মের হিংস্ররূপ তাই এরাজ্যের মানুষের মণিকোঠায় গোপনে ভয়ের কারণ। তা সত্ত্বেও 'মানববন্ধন'-র দৃঢ়তায় এই রাজ্যের মানুষ এগিয়ে আছে। সমন্বয়ী সংস্কৃতির স্বাভাবিক উপস্থিতি সর্বত্র।

২০১১-র মে থেকে ২০১৮-র মে রাজ্যে উন্নয়নের নৌকো কখনও টালমাটাল হয়নি। প্রবল গতিতে তার এগিয়ে যাওয়া।

৩৪ বছরে, রাজ্যের আকাশে থেমে থাকা ঝড় যেন এক লহমায় দিশা পেল মা-মাটি-মানুষের সরকারের প্রবল জনমত-ঘূর্ণাবর্তে। এই ঘূর্ণাবর্তের আঁচ এসেছিল ২০০৯-র লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে।

২০১১-র বিধানসভায় আছড়ে পড়ল ঘূর্ণাবর্ত। স্বতঃস্ফূর্তভাবে। হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচল রাজ্যের মানুষ। এ যেন দ্বিতীয় মুক্তি। দ্বিতীয় স্বাধীনতা।

মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রাজ্যের দিকে দিকে তৃণমূলের মানুষের জয়জয়কারে, উল্লাসে তৃণ-সবুজ স্বপ্নের উড়ান।

মানুষের সরকার শুরু করল মানুষের জন্য কাজ। কয়েক মাস ধরে চলল পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নের নানা কর্মকাণ্ডের 'ভিত্তি' স্থাপন। অশ্রান্তভাবে আজও চলেছে এই কাজের ধারা। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে মানুষের মনে, মুখে একই কথা—এবার সব পাল্টে যাবে। এইভাবেই শুরু হল 'নবনির্মাণ'। নতুন বাংলা গড়ার কাজ। সরকারের বদল হল। বদল হল নীতির, বিশ্বাসের, কর্মপদ্ধতির। উন্নয়নের রথ চলল সকলকে নিয়ে। সকলের হাতে হাতে রথের দড়ি। নানা মত, নানা পথের মানুষের হাতের টানে রথ এগোতে লাগল।

পরিবর্তন শুধু ভোটের সংখ্যায় আসেনি, পরিবর্তন এসেছে ভেতর থেকে। জীবন-রসায়নের এই পরিবর্তনে বাংলা গড়ে উঠতে লাগল নতুন করে। নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াই-এ আবার বাংলা এগিয়ে গেল।

তিনশো বছরের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার ডাক উঠেছিল এই বাংলার ভিতর থেকেই। যদিও স্বাধীনতার সূর্যও ডুবেছিল একদিন এই বাংলার গঙ্গাপাড়ে। বিশ্ব-ইতিহাসের চমকপ্রদ অধ্যায় জুড়ে কেবলই বাংলা-ভাষ্য। বিস্মৃত হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। ভারত তথা বিশ্ব আজও তাকিয়ে থাকে এই বাংলার দিকে চেয়ে।

লড়াই এখানে থামে না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী। এই বাংলার কবির কলমে এমন বাণীই ঝরে। জননী, জন্মভূমির জন্য লড়াই এখানে শাশ্বত। দেশপ্রেমের উৎসভূমি এই বাংলার স্থানমাহাত্ম্যের চিরায়ত ধারা প্রবল বেগে বয়ে যায়। সদা জোয়ার। ভূমি এখানে রক্তে স্নাত। দেশপ্রেমের রক্তে। তাই ভূমির প্রতি এখানে মানুষের সুতীব্র প্রাণের টান। তাই বারে বারে, ভূমি-কেন্দ্রিক লড়াই এখানে 'ইতিহাস' গড়েছে। ডাক দিয়েছে পরিবর্তনের।

সেই ধারাবাহিকতাতেই সিঙ্গুর-এ উড়ছে 'ভূমিজয়'-র কেতন।

মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে শিল্পের ইমারত গড়া যায় না। যদি বা পেশিশক্তির জোরে তা গড়া হয়, ন্যায়ের রায়ে সেই ইমারত ধূলিসাৎ করতে হয়। সমগ্র বিশ্বের কাছে এই ধ্রুব

সত্যকে চোখে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল 'সিঙ্গুর'।

কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলন আর 'সিঙ্গুর'—আজ বিশ্বের কাছে সমার্থক।

এই সিঙ্গুর আন্দোলনই রাজ্যে পরিবর্তনের পটভূমি তৈরি করেছিল। উর্বরা শস্যক্ষেত্র আজও আদিমতার গন্ধমাখা রূপসী হয়ে ওঠে মানুষের কাছে। দুর্নিবার তার টান। সভ্যতা-কে সে জন্ম দিয়েছে। যাযাবর বনচারী মানুষকে সে পায়ে পড়িয়েছে বেড়ি। দিয়েছে স্থির হওয়ার মন্ত্র। দিয়েছে আকাশভেদী ধ্যানের উচ্চতা। প্রসব করেছে কর্ষণ-সংস্কৃতিকে।

গাঙ্গেয় সমভূমির এই বাংলায় 'কৃষি' তাই জীবন-সংস্কৃতির প্রধান-স্তম্ভ। কৃষির হাত ধরে আছে কুটির শিল্প।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার শিল্প-বিপ্লব ঘটাল ইউরোপে। সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যান্ডের উপনিবেশ ভারতবর্ষে পড়ল এর করাল ছায়া। যন্ত্রের আবিষ্কার উৎপাদন-ব্যবস্থাতেও আনল পরিবর্তন। শিল্প আর বন্দি থাকল না কুটিরে। এল কারখানা-প্রথা। সৃষ্টিশীল মানুষ পরিণত হল শ্রমিকে।

ইংরেজরা এই বাংলাতেও শিল্পের প্রসার ঘটালো। তবুও এখানে কৃষিই অর্থনীতির প্রধান মেরুদণ্ড হয়ে থাকল। প্রকৃতিনির্ভর কৃষির সঙ্গে যুক্ত হল আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ। বাঙালির মেধা, মনন, মানসিকতা বাংলার কৃষি-ঐতিহ্য পরম্পরাকে সমৃদ্ধ করে চলল।

এই সমৃদ্ধির-ই-এক সার্থক কথকতা—সিঙ্গুর।

তাই সিঙ্গুরের একফসলি জমি তিনফসলি হয়ে উঠেছিল। এই রূপান্তরের কারিগর যাঁরা তাঁরাই বঙ্গসংস্কৃতির নবরূপকার। আর যেদিন অর্থলোভী শিল্পের হাত পড়েছিল সিঙ্গুরের কৃষিজমির উপর আচম্বিতে, অনাধিকারচর্চায়—সেদিন গর্জে উঠেছিল সিঙ্গুরের মানুষ।

'শিল্পায়ন'-এর নামে কৃষিজমি দখল—আঘাত করেছিল বিশ্বাসে।

গর্জে উঠল বাংলা।

শুরু হল আন্দোলন।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের।

লড়াই কৃষি আর শিল্পের মধ্যে নয়।

লড়াই লোভের বিরুদ্ধে শাশ্বত ঐতিহ্যের।

বাংলার মানুষ বুঝল—এ এক মহাসন্ধিক্ষণ। অন্যায় যত ঘনীভূত হয়েছে তাকে নিকেশ করার প্রাণনাও ততো গভীর।

আর্ত মানুষের চিৎকারে, হাহাকারে বঙ্গজননীর কান শুধু বধির হল তাই নয়। তাঁর হৃদপদ্মের রেণু ঘুম ভাঙালো সকলের। শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, শিক্ষক, ছাত্র, গৃহবধূ—জীবনের সব উঠোন থেকেই এসে হাজির হলেন নানা কর্মের মানুষ। বুক দিয়ে আগলে রাখলেন 'সিঙ্গুরের জমি'।

আন্দোলন ধীরে ধীরে ব্যাপক হয়ে উঠল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণে। পদ্ধতিগত নানা জটিলতায় ঘটনা অসামান্য হয়ে উঠল। হয়ে উঠল বিশ্ব-আন্দোলনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়।

সিঙ্গুর-এর 'ভূমিজয়' বাংলার ভাগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনায় এঁকে দিল নতুন দিকচিহ্ন।

আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত স্লোগান—'পরিবর্তন চাই'।

আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম, নেতাই। ওদিকে লালগড় থেকে শুরু হল শাল-পলাশের জঙ্গলমহল জুড়ে যেন শালগীরার ডাক, যেন আরেক 'উলগুলান'।

সিঙ্গুর-জয়ী সরকারের কথা-রাখার উৎসবের একটি মুহূর্ত

চলছে আন্দোলন। ভুখা মানুষের মিছিল। প্রশাসনিক বৃত্তের বাইরে যেন এক দ্বীপ—জঙ্গলমহল। বিশ্বের মানুষের কানে পৌঁছে গেল সেই সংবাদ। বাংলা আবার বিশ্বের সংবাদ-শিরোনামে। বাংলার মানুষও জানল প্রশাসনিক ক্ষমতার ছত্রচ্ছায়ায় আদিবাসী মানুষদের কিভাবে বঞ্চিত করে চলা হচ্ছে। স্তম্ভিত সকলে। রক্তঝরা সেই আন্দোলনে সামিল জঙ্গলমহলের প্রতিটি মানুষ—স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায়। 'সাম্যবাদ'-এর প্রয়োগ চূড়ান্ত অসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। খোলা চোখ দেখল তাই। শোষণ ও বঞ্চনায় দুর্বল মানুষের ওপর চেপে বসল অত্যাচারের পাহাড়। তৈরি হল ধারাবাহিক 'বঞ্চনা'-র ইতিহাস। দা, বটি, কাটারি, কাস্তে—যে যা পারল তুলে নিল হাতে। এগিয়ে এল মহিলা ও কিশোরেরা। সর্বাগ্রে।

এল পরিবর্তন।

২০১১-র মে। পরিবর্তন এল মহাকরণে। জনজোয়ারে।

সকলের কল্যাণ হোক—এই মন্ত্রে জেগে উঠল বাংলা। এল আগাছা উপড়ে জীবন-অরণ্যে মহৌষধির বীজবপন। এল পরিবর্তন।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে 'সৌজন্য-র বিনিময়' দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। আমন্ত্রিত হয়ে এলেন বিদায়ী সরকারের মুখ্যমন্ত্রীও।

জীবনের বাঁচার রসদ দরকার হল বাংলার সর্বস্তরের মানুষের। একে একে সকলের কাছে পৌঁছল জীবনের বাঁচার রসদ। সমস্যা আছে। হোক সমাধান। যত দ্রুত সম্ভব।

মানুষ এগিয়ে এল। মুখ্যমন্ত্রীও পৌঁছে গেলেন জনসাধারণের মাঝে। আমি তোমাদেরই লোক—সকলের কাছে পৌঁছে গেল তাঁর এই বার্তা।

এই প্রথম বাংলার মানুষ দেখল—মুখ্যমন্ত্রী জেলায় জেলায় গিয়ে রাজ্যশাসন করছেন। সদলবলে। রুটিন করে। সময় বেঁধে। এই প্রথম রাজ্যবাসী দেখল—কাজের স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে যোগ্যকর্মীকে, সম্মান জানানো হচ্ছে কৃতী মানুষদের, শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি-ক্রীড়া সব জগতের মানুষকে যথাযোগ্য পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে।

নেওয়া হল মানবসম্পদ উন্নয়নের ভাবনায় পৃথিকৃৎ সিদ্ধান্ত। শুরু হল 'শিশু আলয়'। শিশুর স্বপ্নের জগৎ হল রঙের, ছবির, খেলার, খাদ্যের সহজযাপন। বাংলার প্রান্তে প্রান্তে তৈরি হল মহাখুশির বাঁচার জগৎ 'শিশু আলয়'। অঙ্গনওয়ারির প্রাঙ্গণে গত সাত বছরে অনেক শিশুআলয় তৈরি হল।

শিশু বিকাশের ভাবনায় এইভাবেই এল সময়োপযোগী পরিবর্তন। ছুটব খেলব হাসব, সবাইকে ভালবাসব—শিশু বাড়তে লাগল, জঙ্গলের নিভৃত ছায়ায়, পাহাড়িয়া গাঁয়ের বাঁকে, নদীতীরের অলস মধ্যাহ্নে, কখনও বা ধূ ধূ মাঠ-প্রান্তরের কিনারে। প্রকৃতি-মুখী শিক্ষায় শিশুর বিকাশের এই উদ্যোগ বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়।

নতুন সরকার প্রথম থেকেই নজর দিল শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের দিকে। 'জাতির ভবিষ্যৎ' গঠনে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণের কাজ শুরু হল।

সুস্থ, সুন্দর শিশু জাতির সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। শিশু-মৃত্যুর হার কমানোয় বিভিন্নভাবে কাজ শুরু হল।

প্রতিটি শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, প্রসূতি মায়েদের যথাযথ পুষ্টির ব্যবস্থা, নিরাপদ প্রসবের জন্য বিনাব্যয়ে 'প্রসবযান'-এর ব্যবস্থা, দুর্গম অঞ্চলের প্রসূতিদের প্রসব-সময়ের আগেই নিরাপদ কেন্দ্রে নিয়ে আসা, পুষ্টি-পুনর্বাসন কেন্দ্রে কম ওজনের দরিদ্র শিশুকে নিয়ে রাখা, পুষ্টিযুক্ত খাবার ও ওষুধ দেওয়ার পাশাপাশি বিশেষ প্যাকেজের মাধ্যমে খাদ্যের ব্যবস্থা করা,—নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুর নিরাপদ প্রসব এবং মা ও শিশুর প্রসবোত্তর যত্ন, পরিচর্যার ব্যবস্থা করার জন্য 'সুরক্ষিত' বৃত্ত নির্মাণে নতুন সরকারের সাফল্য প্রশ্নাতীত। আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও শিশুআলয়-এর মাধ্যমে শিশুর প্রয়োজনীয় শারীরিক ও মানসিক পুষ্টির ব্যবস্থা করছে সরকার।

সমাজে 'শিশুপাচার' একটি ব্যধির মতো শিকড় গেড়েছে। এই প্রথম শিশুর নিরাপত্তার জন্য অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করল রাজ্য সরকার। সরকারি, বেসরকারি শিশু আবাসগুলিতে পূর্ণ নজর রাখা হচ্ছে। নানাভাবে অপরাধ জগতের সঙ্গে শিশুদের জড়িয়ে ফেলতে সক্রিয় থাকত কিছু চক্র।

অভিভাবকহীন, অনাথ শিশু-কিশোরদের অন্ধকার জগত থেকে দূরে রাখা, ফিরিয়ে আনা এবং তাদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের মূলস্রোতে সাঁতরাতে সাহায্য করাই সরকারের অন্যতম মূল লক্ষ্য। নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে চলছে এই কাজ।

কন্যা সন্তানদের জন্য সরকারের কাজ বিশ্বের শিরোপা অর্জন করেছে। দারিদ্র্যের কারণে 'বাল্যবিবাহ' রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। পরিবারে 'কন্যাসন্তান' যেন বোঝা। বিয়ে দিয়ে তাকে অন্য ঘরে পাঠাবার চিরকালীন সুযোগটিকেই গ্রহণ করত দরিদ্র পরিবারগুলি। কিছুটা নিরুপায় হয়ে, কিছুটা ভাবনার অভাবে।

ঘরের মেয়েরা 'কন্যাশ্রী'। ওরা সম্পদ। ওদের মধ্যেও আছে সম্ভাবনা, শক্তি, সাহস। ওরা নিজেরা এগোবে, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। 'বোঝা' নয়, ওরা 'শক্তি'—এই উদ্দেশ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সূচনা।

গত কয়েক বছরে 'কন্যাশ্রী'-র মেয়েরা দেখিয়ে দিয়েছে সমাজ-পরিবর্তনে তাদের ভূমিকা কতটা। নারীর ক্ষমতায়নের জয়যাত্রায় তাদের দামাল পদচারণা।

তারাই নির্মাণ করে চলেছে তাদের পথ।

সবলা, কিশোরী শক্তি যোজনা, স্বাবলম্বন স্পেশাল, মুক্তির আলো—নানা প্রকল্পের মাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর উৎক্রমণের রঙীন পথনির্দেশিকা বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের জন্যও সরকার সমানাভূতিতে ভাস্বর।

সরকারের 'মানবিকতা' প্রসারিত হল সমাজের এককোণে পড়ে থাকা 'লিটল স্টার'-দের জন্য, রূপান্তরকামীদের জন্যও। সুযোগ, সুবিধা, সহায়তার মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকের জীবন যাতে বিকশিত হতে পারে, পূর্ণত্ব প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে পারে তারই প্রয়াস নেওয়া হল।

নজিরবিহীন এই উদ্যোগ।

সবুজ বাংলা

বাঁচতে হবে বাঁচার মতো। স্বচ্ছন্দ। স্বাভাবিক জীবনবান্ধব পরিবেশে।

নগরায়ণ-এর ভাবনায় এই বাঁচার ভঙ্গিতেই জোর দেওয়া হয়েছে।

শুধু বাঁচা নয়। সুন্দরভাবে বাঁচা। আর তারই জন্য তৈরি হচ্ছে সুন্দর পরিবেশ। পরিবেশগত উন্নয়ন যেমন বাঁচার অন্যতম শর্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য টেকসই উন্নত জীবনমুখী পরিবেশ উন্নয়নও অন্যতম শর্ত। তাই গুরুত্ব পেয়েছে 'সৌন্দর্যায়ন'। জীবনের প্রাত্যহিকতায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে 'সুন্দরের আরাধনা'।

সভ্যতার প্রযুক্তিনির্ভরতা মানুষকে ক্রমশ্য বাধ্য করছে প্রকৃতি থেকে দূরে চলে যেতে। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের টানে মানুষ ক্রমশ ভিড় জমাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে শহরে।

ইট-কাঠ-পাথরের অরণ্যে জীবন হয়ে উঠছে যান্ত্রিক। প্রকৃতি বিচ্ছিন্নতায় যন্ত্রণাময়। হৃদয়ের স্বাভাবিক বিকাশ হচ্ছে ব্যাহত। পরিবার-কাঠামোর ক্রমভাঙ্গন ভোগবাদ-প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। তৈরি হচ্ছে মানসিক-বিচ্ছিন্নতা। সভ্যতার আত্মা চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন। হাতের মধ্যে মুঠোবন্দি বিশ্ব। তবু ছোটো পরিবারে সকলে একা হয়ে পড়ছে। মানুষের মধ্যে 'নিঃসঙ্গতাবোধ' বাড়াচ্ছে। অন্তরঙ্গতার অভাব পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। 'সুখী গৃহকোণ' আজ বিপর্যস্ত। এক্ষেত্রে সামাজিক সংযোগ খুব জরুরি।

সবুজ জীবন-পরিসরের মধ্যে আধুনিক নাগরিক বেঁচে থাকার রসদ পাবে। তারই জন্য 'সবুজ শহর'-এর পরিকল্পনা। প্রাণের স্পর্শে সর্বদা প্রাণিত থাকবে সকলে। সবুজের প্রসারিত আলিঙ্গনের মধ্যেই 'নিঃসঙ্গ' মানুষ পাবে মুক্তির স্বাদ। তাই দায়বদ্ধ সরকারের ভাবনায় শুধু খাদ্যদান, বইদান, সাইকেল দান, ওষুধ তথা চিকিৎসা দান, বাড়ি-আলো-জল দানই মুখ্য হয়ে ওঠে না। মানুষের মনের খোঁজ

তাকে রাখতে হয়। ভাবতে হয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের বাঁচার রসদ কিভাবে তাকে জোগাতে হবে।

এই ভাবনা ও পর্যবেক্ষণের সঠিক মূল্যায়নের ফলে আধুনিক নগরায়ণ ভাবনার বিভিন্ন দিকগুলিকে সুচিন্তিতভাবে এরাজ্যে বাস্তবায়নের কাজও চলছে শুরু থেকে। মরমি প্রশাসনের এ এক প্রশংসনীয় নজির।

সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষের জন্য সরকারের আছে নানা প্রকল্প। ঠিক ততটাই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সমাজের এগিয়ে যাওয়া মানুষের জন্য পাশে থাকার অঙ্গীকারকে রূপ দিতে।

তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে জরুরী হয়ে উঠেছে এই বাংলায়। আধুনিক শিক্ষায় প্রথম পা ফেলে হাঁটতে চেয়েছিল বাংলার মানুষ। ভারতে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদের শুরু হয়েছিল বাংলার মানুষের হাত ধরে। তাই দেখা যায় 'ঘরকুনো' বাঙালি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে দেশের নানা প্রান্তে, বিশ্বের দিকে দিকে।

বাঙালির এই 'আধুনিক' হয়ে বাঁচার সুতীব্র চাহিদা তার মননমুখী মানসিকতার বিকাশ ঘটিয়ে চলেছে ঘরে-বাইরে।

বাঙালির মেধাসম্পদকে 'ঘরমুখী' করে তুলতে উন্নত জীবনমুখী বাঁচার পরিবেশ প্রয়োজন। নতুন সরকারের আপ্রাণ চেষ্টায় আজ কিছুটা সার্থক হয়ে উঠেছে এই প্রয়াস। কলকাতার মতো একটা পুরানো শহরকে রাতারাতি বদলে দেওয়া যায় না। কিন্তু সম্প্রসারিত করা যায়।

তাই নগর কলকাতা তার ডালপালা মেলে ক্রমশ্য 'মহানগর'-এর বৃত্তের ব্যাস বাড়িয়ে তুলেছে।

আধুনিক জীবনের সবরকম সুযোগ সুবিধা নিয়ে গড়ে উঠেছে 'সবুজ শহর'

তেমনিই উন্নয়নের প্রয়াস চলছে গ্রাম বাংলার দিকে দিকে। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন গ্রামোন্নয়নের দৃশ্যমানতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

গ্রামে রাস্তাঘাটের আমূল পরিবর্তন গ্রাম-জীবনকে গতি এনে দিয়েছে। আলোকিত গ্রাম গ্রামজীবনকে আরও বেশি গঠনমূলক, কর্মমুখর ও নিরাপদ করে তুলছে।

মৌলিক পরিষেবাগুলি গ্রামের দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে।

মানুষ এখন অনেক সচেতন তাঁদের প্রাপ্য বুঝে নিতে। প্রযুক্তির ব্যবহারেও তাঁরা ক্রমশ দক্ষ হয়ে উঠছেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো বিষয়গুলির ক্ষেত্রে তাঁদের আগ্রহ বেড়েছে অনেক। শিক্ষার আওতায় সব মানুষকে আনার প্রয়াস, সকলের কাছে আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা—নতুন সরকারের মানব-উন্নয়ন ভাবনাকে সকলের হৃদয়ে সত্য করে তুলেছে।

সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষেরা আজ আত্মপ্রত্যয়ী। নিবিড় বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁরা উপলব্ধি করছেন—তাঁদের মত প্রকাশে তাঁরা কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নেননি।

বিগত প্রায় সাত বছরে তাঁরা তাঁদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা সঠিকভাবে প্রয়োগ করেছেন। নতুন সরকারের কাজে তাঁরা খুশি। তাঁদের আস্থা অটুট। আগামীতেও সেটাই প্রতিফলিত হবে। কারণ এই সরকার লোকদেখানো উন্নয়নের চমকদারিত্বে বিশ্বাসী নয়।

প্রশাসনকে 'মহাকরণ'-এ আটকে রেখে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে জ্ঞানী-গুণী মানুষদের আলোচনাসভা চালায় না।

প্রশাসনের প্রতিটি স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও কর্মীকে নিয়ে নিয়মিতভাবে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে নিয়ে যান মন্ত্রী, সচিব ও আধিকারিকদের।

এই 'প্রশাসনিক সচলতা' বাংলাকে 'সচল' করে দিয়েছে। কূপমণ্ডুকতার অন্ধবলয় থেকে বেরিয়ে এসেছেন মানুষ।

বুঝেছেন তাঁরা—সরকার আমাদের, আমরা সরকারের। অথবা আমরাই সরকার।

গ্রামের মানুষরাই ঠিক করেন—কোন চাহিদাটা তাঁদের আগে—রাস্তা, না জল, না অন্য কিছু।

আলাপচারিতার মাধ্যমে গ্রামের মানুষ সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্তই নানা স্তর পেরিয়ে একদিন 'কাজ' হয়ে ওঠে। মানুষ খুশি হন। নিজেদের জীবনের প্রয়োজনগুলো নিজেরা মেটাতে পারছেন সরকারি প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যেই।

এইভাবেই 'স্ব-শাসন' হয়ে উঠছে আক্ষরিক অর্থেই সফল। পঞ্চায়েত এবং পুরসভার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন এবং নগরোন্নায়ন সার্থক ও প্রয়োজনভিত্তিক হয়ে উঠেছে। এই পথেই চলছে বাংলার 'নবনির্মাণ'।

সংস্কৃতির বাংলা

সময় থেমে থাকে না। 'পরিবর্তন' কালের নিয়ম। কিন্তু 'পরিবর্তন' মানেই 'উন্নয়ন' নয়, এগিয়ে যাওয়া নয়। স্বাধীনাতা পেয়েছি মাত্র সত্তর বছর। এক বৃহৎ সাম্রাজ্য থেকে ছিটকে, খণ্ডিত হয়ে এই একটুকরো রাজ্য হয়ে এক বিরাট 'গণতন্ত্র'-এর নির্মাতা এবং পরিচালক হয়ে ওঠার জন্য সব মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারেনি, গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলছে।

একদিকে দারিদ্র্যের মোকবিলা করা, অন্যদিকে নিজেকে গড়ে-পিটে 'সার্থক' গণতন্ত্র-র যোগ্য কর্মী হয়ে ওঠা। রাজ্যের আপামর মানুষের নিরন্তর লড়াকু প্রয়াসের ফলে অনেকটাই সার্থক।

বাংলার মানুষ এক বিরাট ঐতিহ্যের পরম্পরার ধারক ও বাহক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব জীবন-সংস্কৃতির প্রকাশ। এত বৈচিত্র্য, এত বর্ণময়তা—বিস্মিত করে। সুগভীর পর্যবেক্ষণের ফলে উঠে আসা এর গভীর শিকড় সন্ধান।

শান্তিপ্রিয় জীবনযাপন তাঁদের লক্ষ্য। উদ্দেশ্য সহজ-সরল ভাবমুখী জীবনের মধ্যে সহজসিদ্ধ অবস্থান। তাঁদের অধ্যাত্মমানসের একরূপতা নানা ধর্মের সহাবস্থানকে সম্ভব ও শান্তিমুখর করে রেখেছে। এরই প্রকাশ নানা উৎসবে, প্রথায়, আচার-বিন্যাসে। এইসবের মধ্যেই জীবন এখানে পল্লবিত।

নতুন সরকার রাজ্যবাসীর মরমীয়া সাথী। তাই তাদের উৎসবের ষোলকলায় সরকারি সহযোগিতার হাত প্রসারিত।

উৎসবের মধ্যেই বারবার প্রমাণিত হয়ে চলেছে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর অটুট বন্ধন। এই উৎসবের মধ্যে সংস্কৃতির বিশ্ব-বিকাশের অবসর। সাবেকিয়ানার সঙ্গে আধুনিকতা, চিরায়ত শিল্পের সঙ্গে প্রযুক্তির প্রয়োগ, সুপ্রাচীন ধ্যানধারণার সঙ্গে উচ্চাঙ্গ ও লোকশিল্পের বিকাশ-মগ্নতা। বিভিন্ন জীবনশৈলীর মানুষের একই আঙ্গিনায় দাঁড় করানো—উৎসবের প্রাণভোমরা তো এখানেই।

বাংলার মানুষের এই প্রিয়-জীবনছকে সরকারও অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়ে, হয়ে ওঠে প্রধান উদ্যোগী। উৎসব-অর্থনীতির বিস্তৃত পরিসর জুড়ে যুক্ত হয়ে পড়ে বিশ্বের মানুষও। বিশ্বের কোণে কোণে বাংলার ঢাক বাজে উৎসবের হাত ধরে জেগে ওঠে বিশ্ব-বাংলা। মেতে ওঠে বিশ্বে বাংলা

বাঙালিয়ানার নানা উৎসবে বিশ্ব জুড়ে তৈরি হয় জীবনের কোলাজ। তাই দেখা যায়, বাংলার শারদোৎসবে ভিড় করেন অন্য দেশের উৎসাহী মানুষ।

এ তো গেল চিরায়ত উৎসবের পাপড়ি মেলার কথা।

হারিয়ে যাওয়া প্রথা, আচার, ব্রত, নিয়েও আমাদের উৎসাহ বেড়ে চলেছে। বাংলার 'নবান্ন' উৎসবকে শ্রদ্ধা জানিয়েই তো রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকেন্দ্র-র বাড়িটির নাম 'নবান্ন'। সরকারের দেশজ সংস্কৃতির প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস—এই নামকরণেই প্রকাশিত। এখানেই সরকারের আস্থা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

বাংলা বৈচিত্র্যময়। নানা জনজাতির, নানা লোকজ সংস্কৃতির চর্চা চলছে আবহমান কাল ধরে। প্রযুক্তি-বিশ্বের উন্নয়নের হাতছানি তাঁদের দোরেও কড়া নাড়ছে। এগিয়ে চলার ছন্দে তাঁরাও পা মিলিয়েছেন। তবু তাঁদের বাঁচার শিকড় নিয়েই বঙ্গ সংস্কৃতির শিকড়ে নতুন করে 'জলদান-এর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

লোকজ সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো হচ্ছে 'লোকপ্রসার' প্রকল্পের মাধ্যমে। লোকসংস্কৃতির নিবিড় চর্চায় প্রায় দুই লক্ষ আর্থিক সহায়তারপ্রাপ্ত শিল্পী এখন মগ্ন।

শুধু লোকসংস্কৃতির প্রসার নয়, সংস্কৃতির মূলধারায় এর সংযোজন—দৃষ্টিভঙ্গিগত এই 'পরিবর্তন' বাংলার 'নবনির্মাণ'-কে শক্তি যোগাচ্ছে।

এতদিন যাঁরা ছিলেন বৃত্তের বাইরে এখন তাঁদেরই প্রবল প্রাধান্য। বাংলায় গণতন্ত্রের সাংস্কৃতিক অভিমুখকে নতুন দিকনির্দেশ দিচ্ছেন তাঁরাই। বাংলার জীবন-সংস্কৃতির মৃত্তিকা-সংলগ্নী প্রকৃত ভিত্তি আজ নতুন করে স্বীকৃত ও সম্মানিত।

লোকসংস্কৃতির চর্চায় আধুনিক প্রজন্মও প্রাণিত হচ্ছে, যুক্ত হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে বিষাদমগ্নতার যে কালোছায়া হৃদয়-আকাশে প্রতিবিম্বিত তারই স্বাস্থ্যকর মোকাবিলার এটি একটি শুভদিক। জ্ঞানচর্চার সুযোগ-সুবিধা এখন সকলের মুঠোবন্দি। তবু প্রসারিত অঙ্গনে একতারা হাতে বাউলের সুরে সুরে মনের মানুষের খোঁজ জীবনের উত্তাপে ভরপুর করে তোলে। মৃত্যুশীতলতার সমাধি ঘটে।

নতুন সরকার নতুনত্বের পূজারীই শুধু নয়। পুনর্জাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত যেন। নিভে যাওয়া পরম্পরার আলোকশিখা নতুন করে জ্বালাতে জানে, জানে 'জাগরণ' মন্ত্রে সকলকে উদ্‌বোধিত করতে।

শ্রমের মর্যাদা

অনু, ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলার সাফল্য চোখে পড়ার মতো। কৃষির পরে এই ক্ষেত্রে দক্ষ/অদ শ্রমিকের কর্মসংস্থান রাজ্যের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে রেখেছে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত 'শ্রমিক'রা তাই রাজ্যসরকারের বিশেষ নজরে থাকে। তাঁদের জন্য সরকার সর্ব উদ্‌গ্রীব। রাজ্যের এই 'বিপুল শ্রমশক্তি' রাজ্যের সম্পদ। তাঁদের বিভিন্ন নিরাপত্তা ও সুযোগসুবিধা দেওয়া জন্য নতুন সরকারের উদ্যোগ প্রশংশনীয়।

এরাজ্যে দক্ষ, অদক্ষ—উভয় শ্রমিকেরই প্রাচুর্য আছে। এই 'শ্রমশক্তি'-র সঠিক ব্যবহার করতে পার রাজ্যের উন্নয়নের 'লেখচিত্র' অন্যরকম হতো। যাই হোক, যে শ্রমিকদের দিন-রাত সক্রিয় অংশগ্রহণে ছু চলেছে রাজ্যের কর্মমুখর-অর্থনীতি, সেই শ্রমিক-দের জন্য সরকারি ভাবনায় 'সময়োপযোগী পরিবর্তন' ঘ চলেছে। বিনা আন্দোলনে। বিনা রক্তপাতে। ফলে এই রাজ্যে শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসকে পাল্টে দিয়ে সরকারের 'মানবিক' প্রয়াস। নতুন সরকার, শ্রমের সঠিক মর্যাদা দিতে চালু করেছে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প।

গ্রামবাংলার কুটির শিল্প একসময় মুখ থুবড়ে পড়েছিল। শিল্পবিপ্লবের কারখানাপ্রথার কারণে।

আজ কিন্তু চাকা আবার পুরানো পথেই ঘুরছে।

'স্বনির্ভর বাংলা' গড়ার প্রয়াস রাজ্য জুড়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ব্যক্তি-জীবনকে নানাভাবে প্রভাবি করে চলেছে। কী গ্রাম, কী শহর—সর্বত্রই 'স্বাধীনভাবে বাঁচার একটা প্রয়াস চোখে পড়ছে।

নিজের জীবন নিজের গড়ে নেওয়ার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। যাঁরা নিজের মতো বাঁচতে চান—তাঁদে জন্য আছে সরকার।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে সদস্যরা সমবেতভাবে বা একক উদ্যোগে অর্থ রোজগারের চেষ্টা করছেন। কেউ বা 'স্বনিযুক্তি'-র মাধ্যমে নিজস্ব উদ্যোগ গড়ে তুলছেন।

কর্মহীনতা থেকে সকলেই মুক্তি চায়।

তাছাড়া, সুস্থ জীবনের জন্য প্রত্যেকেরই কাজের প্রয়োজন। মানসিক-স্বাস্থ্যের জন্যও আজ অপরিহার্য হ উঠেছে—WORK-THERAPY। কাজেই আনন্দ। কাজেই মুক্তি। কাজেই ব্যক্তিমনের বিকাশ। কম হোক, বে হোক—কাজেই সম্মান। কাজের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে 'আত্মসম্মান' 'আত্মমর্যাদা'। 'কর্মহীন' মানুষের ভূমিক সমাজ, পরিবার, বন্ধুমহল সকলের কাছেই অসম্মানজনক।

অথচ সরকারের কাছে প্রতিটি মানুষই সমান এবং সম্মানীয়। সকলের জন্যই সরকারের দায়বদ্ধতা। এ দায়পালনে সরকার সর্বদা সচেষ্ট।

সামর্থ্য কম। ইচ্ছাশক্তি প্রবল। বর্তমান সরকার পরিচালনার দায়িত্ব যাঁরা কাঁধে তুলে নিয়েছেন—রাজ্যের প্রতিটি মানুষের জন্য তাঁদের ভাবনা প্রতিনিয়ত নানা 'প্রকল্প' ও 'কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে রূপ পাচ্ছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের কাজ চলছে নানা বিভাগের মাধ্যমে। গ্রাম ও শহরে চলছে নানামুখী উদ্যোগ। তবুও বলতে হবে গোষ্ঠী গঠন আর গোষ্ঠীর সক্রিয় অর্থনৈতিক কাজ করা এক কথা নয়।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের অনেক সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু এই গোষ্ঠীগুলিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আরও বেশি করে যুক্ত করা দরকার। সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু এই বিপুল কর্মকাণ্ডকে সফল করে তুলতে গেলে সমাজের সব অংশের সক্রিয়তা প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রতিটি ক্ষেত্রে বিচার করে সেই অনুযায়ী 'কাজ'-এর সূচনা।

বর্তমান সরকারের সাফল্যের অন্যতম কারণ—সমন্বয়। এই কর্মনীতি-ই নবনির্মাণ-এর মূল শক্তি। সমন্বয়ের মাধ্যমেই গড়ে উঠছে নতুন বাংলা।

নোটবন্দি-র খেসারত দিতেও এগিয়ে এসেছে শ্রমদরদি সরকার। কাজ হারানো প্রবাসী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ায় সরকার।

আচমকা ৮ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখের মধ্যরাত থেকে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটবাতিলের ঘোষণা—গণতন্ত্রে এক বিরাট ধাক্কা। 'নোটবন্দি'-র এই ছক কিছু অশুভ আঁতাতের মোকাবিলা করার জন্য, এমন কথা বলা হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘোষণায় নিদারুণ সমস্যায় পড়েন দেশবাসী।

স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা অর্থনীতি। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের দিনগুজরান করাই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

আজও সেই স্মৃতি তাঁদের তাড়িয়ে বেড়ায়।

এই বিপদে একমাত্র প্রতিবাদী মুখ হয়ে ওঠেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

খুচরোর অভাবে বন্ধ হয়ে যায় অনেক উৎপাদনমুখী শিল্পকেন্দ্র। কাজ হারায় মানুষ। বিকল্প আয়ের সন্ধানে যুক্ত হয়ে পড়েন অন্য কাজে।

পশ্চিমবঙ্গে ছোট শিল্পের ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা যায়। এখনও যা সামলে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু মুশকিলে পড়েন রাজ্যের বাইরে থাকা শ্রমিক/কর্মীরা। কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অর্থাভাবে ফিরে আসেন নিজের রাজ্যে, নিজের বাড়িতে। অনেকক্ষেত্রেই আর পুরানো কাজে গিয়ে যোগদানের সুযোগ থাকে না। এই কাজ-হারানো মানুষদের আর্ত-হাহারব রাজ্য সরকারের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। সহযোগিতার উদার হাত এগিয়ে যায় তাঁদের দিকে। চালু হয় 'সমর্থন' প্রকল্প।

রাজ্যে 'কর্মহীনতা'-র চাপ স্বাভাবিকভাবেই বেশি। এর মধ্যে বাইরে থেকে ফিরে আসা দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিক/কর্মীরা 'কর্মহীন' হয়ে বসে থাকলে দারিদ্র্যের বোঝা আরও বাড়বে। তৈরি হবে আরও নানাবিধ সামাজিক সমস্যা।

সুতরাং সমাধান চাই। দাঁড়াতে হবে তাঁদের পাশে।

একদিকে 'নোটবন্দি'র লাগাতার বিরোধিতা। 'নোটবন্দি'-র ফলে সৃষ্ট নানা সমস্যার মোকাবিলা তো আছেই। সঙ্গে থাকল সক্রিয় 'সমর্থন'—'নোটবন্দি'র শিকার অসহায় মানুষদের।

নারীর শ্রমকে 'সম্মান' জানানোর সদিচ্ছা সভ্যতার দান। সংসারে নারী-র বহুমুখী ভূমিকা। ঘরের বাইরে পা ফেলে সমতালে 'নারী' চলেছে এগিয়ে। কিন্তু তবুও 'ঘর' তাঁকে ছাড়ে না, তাঁরও মন পড়ে থাকে ঘরে।

নারীর সৃজনী-ভূমিকায় বিশ্ব-সংসারে প্রবাহমানতা অস্তিত্বশীল। নারীই দীর্ঘ দশ মাস সন্তানকে দেহে ধারণ করেন, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর লালন-পালনের দায়িত্বও তাঁর। ছয় মাস বয়স পর্যন্ত নবজাত শিশুর একমাত্র খাদ্য ও পানীয় তার মায়ের 'দুধ'।

সুতরাং চাকুরিরতা মাকে সুদীর্ঘ অবসর দিতেই হবে। এটা তাঁর প্রাপ্য।

রাজ্য সরকার চাকুরিরতা মায়েদের সন্তানের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ৭৩০ দিনের ছুটির ব্যবস্থা করেছে। এই সবেতন ছুটি 'নতুন সরকার'-এর 'জননী ও সন্তান'-এর জন্য এক বিরাট উপহার। 'মা' এই সাহচর্যে 'সন্তান'কে সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করবে। নতুন প্রজন্মকে 'সঠিক নির্মাণ'-এর স্বাস্থ্যকর পরিবেশ যেন বাংলার 'নবনির্মাণ'-এর আর এক পালক।

উন্নয়নে দিশা এবং দিশায় উন্নয়ন

দেবাশিস ভট্টাচার্য

স্বাধীনতার পর ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি প্রথা বিলোপ আইন হয়। পরের বছরই ভূমি সংস্কা আইন হয়। তখনকার ভূমি সংস্কার আইনে বলা ছিল, একটি পরিবার সর্বোচ্চ ৭৫ বিঘা জমির মালিক হ পারবে। তখন বাংলার সব ব্লকেই তিন-চার জন জমিদার পাওয়া যেত যাঁদের মালিকানায় তিন-চারশো বি জমি থাকতই। কারও কারও আরও বেশি। ১৯৫৪ সালে ভূমি সংস্কার আইন পাশ হওয়ার পর জমিদাররা ৭ বিঘার বেশি জমি বাড়ির কাজের লোকদের নামে করে রাখত। এটাকেই বলা হত বেনামা জমি। এমন স বেনামা জমি উদ্ধার করে তা সরকারের আওতায় এনে অর্থাৎ খাস জমি করে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা জন্য গ্রামে কৃষক আন্দোলন হত। ১৯৫৪ থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে এমন আন্দোলন শক্তিশালী ছিল। ১৯৭ ৭৪ সালে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের আমলে বেনামা জমি উদ্ধার করে খাস করা বেশ ভালো পরিমাণে হয়। কি সেই খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে আর বণ্টন করা হয়নি।

১৯৭৭ সালের ২১ জুন রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। বামফ্রন্ট সরকার ২৩ লক্ষ ভূমিহী কৃষককে ওই খাস জমির একটা ছোটো অংশ পাট্টা হিসেবে দেয়। সুখেন মণ্ডল এবং দুখু হোসেনরা এক দেড় বিঘা করে জমি পায়। সেই জমি পাওয়ার পরেই তাঁদের মুখে হাসি ফোটে। ভূমিহীন মানুষ ভূমি মালিক হলেন, তাই মুখে হাসি। কিন্তু দশ বছর পরেই সেই হাসি মিলিয়ে যায়। কারণ, অত ছোটো জমি বীজধান ঢেলে, সার কিনে, সারা বছর খেটে যে কয়েক বস্তা ধান পাওয়া যেত, তা দিয়ে সারা বছর খোরা

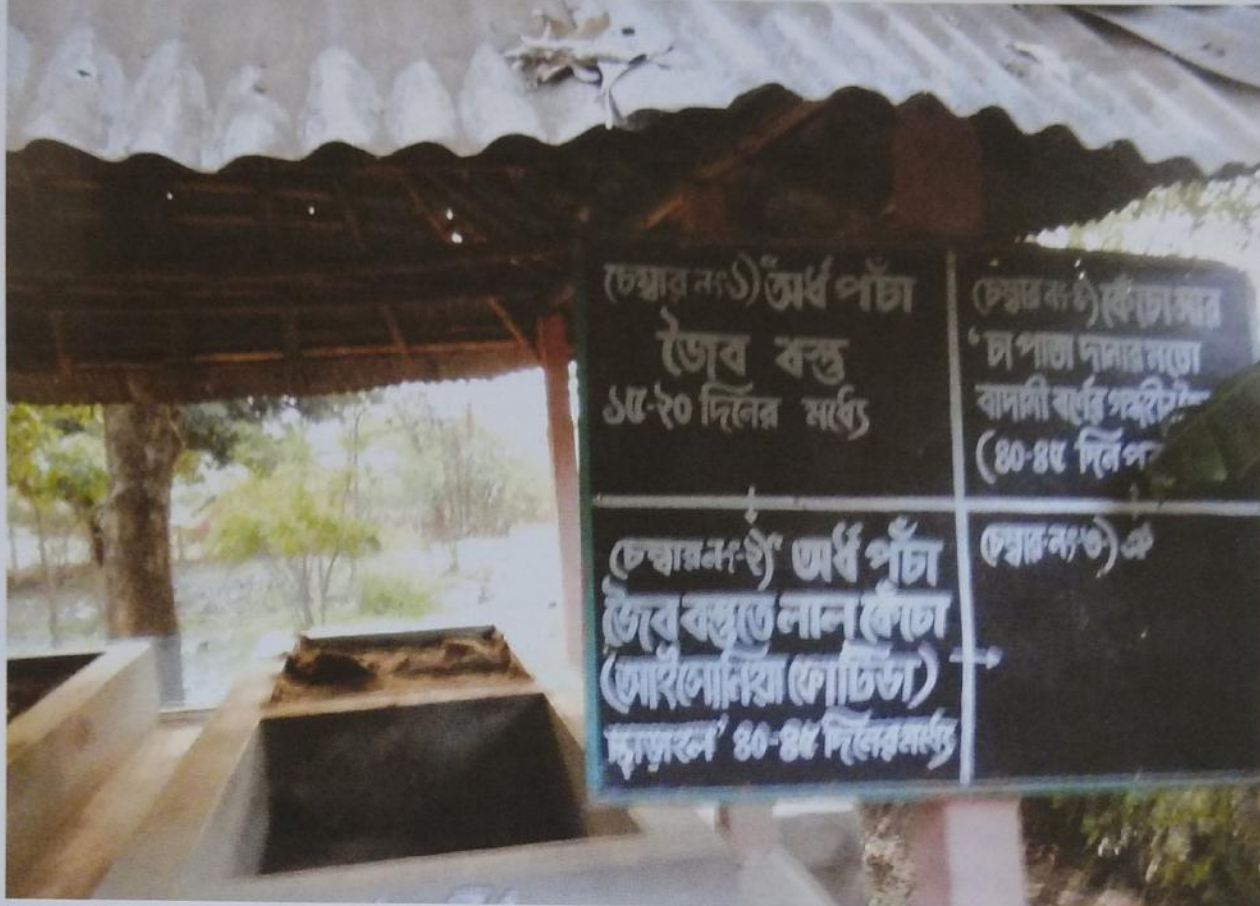

ধানও হত না। এর ফলে বহু পাট্টা পাওয়া চাষি সেই জমি ফেলে অন্যের জমিতে অথবা ফুড ফর ওয়ার্ক, আইআরডিপি নিদেনপক্ষে রাজমিস্ত্রির হেল্পার হিসেবে কাজ করে দৈনিক কিছু টাকা মজুরি পাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৩ সাল থেকেই বিধানসভায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের (তখন এই নাম ছিল। ১৯৭৭ সালের পর দফতরের নাম ভূমি ও ভূমি সংস্কার হয়।) বাজেট বিতর্কে অনেক বিধায়ক বলতেন, বাংলায় যা জমি আছে তা ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করলেও প্রত্যেকের মালিকানায় অতি অল্প পরিমাণ জমি আসবে। তা দিয়ে ভূমিহীনদের সংসার চলবে না।

কিন্তু বামপন্থী দলগুলির বিধায়করা সেই ভূমি সংস্কারের পুরোনো দাবিতেই অটল থাকতেন। এটাও ঠিক ওই স্লোগানে আন্দোলন করে তাঁরা কৃষকদের মধ্যে সমর্থকভিত্তিও তৈরি করেছিলেন। সেই সব কৃষক নেতারা খুবই সৎ, সরল জীবনযাত্রার কৃষকদরদী মানুষ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের ততটা দূরদৃষ্টি ছিল না। প্রথম বামফ্রন্ট সরকার সেই পুরোনো দাবি কার্যকর করার ১০ বছর পরেই কৃষকদের মুখের হাসি কমে যায়। কৃষকরা অন্যের জমিতে কাজ করতে থাকেন। গ্রামীণ দারিদ্র্য না কমে বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বামপন্থী নেতারা তখন ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভের সমীক্ষা রিপোর্ট দেখিয়ে বলতেন, গ্রামাঞ্চলে একটা বিরাট শিল্পপণ্যের বাজার সৃষ্টি হয়েছে। সেটা সত্যি কথা। ১৯৭৪ সালের তুলনায় ১৯৯৪ সালে গ্রামবাংলায় কৃষক পরিবারগুলির শিল্পপণ্যের কেনাকাটা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৪ সালে যেটা হয়, সেটা পরের বছরগুলোতে আর তত বৃদ্ধি পায় না। যাকে বলা যেতে পারে কৃষক পরিবারগুলি ধুতি, শাড়ি, জামাকাপড়, সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদি কেনার ক্ষমতা স্যাচুরেট করে যায়। ভূমি সংস্কারের পরেও এই অবস্থা দেখে বামপন্থী নেতারা প্রকৃত কারণ এবং করণীয় সঠিক পদক্ষেপ না ভেবে এটা-ওটা বলতে থাকেন। আর দশ বছর পরে এসে তাঁরা বলতে লাগলেন, কৃষকের ছেলে আর কৃষক হতে চাইছে না। তারা মাস মাইনের চাকরি করতে চাইছে। কথাটা অর্ধ সত্য কিন্তু পুরো সত্য নয়। পাট্টা পাওয়া জমি থেকে ফসলের পরিমাণ যদি আরও অনেকটা বেশি হত তাহলে ওই সব কৃষক পরিবারগুলির মুখে হাসি মিলিয়ে যেত না। সেটার জন্য দরকার ছিল কৃষিতে সমবায় প্রথা জোরদার করা।

১৯৭৪ সালে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের আমলে রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান ড. অজিত নারায়ণ বসু এবং পর্ষদের সদস্য পান্নালাল দাশগুপ্তের পরিকল্পনায় আল ভেঙে সমবায় প্রথায় চাষ করার জন্য কম্প্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (সিএডিসি) তৈরি হয়েছিল। সেই সময় বৈঁচি, কালনা, অযোধ্যা, হরিণঘাটা, নকশালবাড়ি—এমন ২১টি জায়গায় সিএডিসি প্রকল্প চালু হয়েছিল। চালু হওয়ার ৩-৪ বছরের মধ্যেই দেখা গেল সমপরিমাণ জমিতে আগের তুলনায় ফসলের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কৃষকদের মুখে হাসি ফোটে। এটা বলছি ১৯৭৭-৭৮ সালের কথা। তখনও প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার ততটা বাস্তবায়িত হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার এসে ভাবল সিদ্ধার্থশংকর রায়ের আমলের প্রকল্প মানেই সেটা খারাপ। তাই সেই প্রকল্পে গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হল। বামফ্রন্টের একজন বড়ো মাপের নেতা ১৯৭৮ সালেই সিএডিসির বিরোধিতা করে লিখেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার যদি ২১টি সিএডিসিকে চাঙা করে পাট্টা পাওয়া কৃষকদের বুঝিয়ে আরও ২১,০০০ সিএডিসি প্রকল্প তৈরি করত তা হলে গ্রামের চেহারা ১৯৯৪ সালে অতটা খারাপ হত না। বামফ্রন্ট নেতারা কৃষকদের স্বার্থে ভেবেছেন, কিন্তু সরকারে এসে কাজ করতে গিয়ে দূরদৃষ্টি দেখাতে পারেননি। তাই ভূমি সংস্কার বাংলায় কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। ভূমি সংস্কারের পরের ধাপেই যদি কৃষিতে সমবায়কে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হত তাহলে কৃষকদের হাতে আরও পয়সা আসত। এ বিষয়ে বহু আলোচনা দরকার। বোঝা যায়, বামফ্রন্ট কৃষকদের স্বার্থে ভাবলেও দিশা ঠিক ছিল না, বা বলা যেতে পারে সুদূরপ্রসারী ফল কী হবে তা জানা ছিল না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানেই অভিনবত্ব, আধুনিকতা এবং কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কৃষকরা তাঁদের ফসল বিক্রির যাতে সুযোগ পান সে জন্য বিভিন্ন মহকুমায় কিষান মান্ডি তৈরি করা হয়েছে। কৃষকদের কাছ থেকে সরকার ন্যায্যমূল্যে ধান কিনে তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে অথবা চেক ধরিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে মিডলম্যান বা ফড়েদের যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে। অঞ্চলে অঞ্চলে শিবির করে সরকার ধান কিনে নিচ্ছে। কৃষক খুশি হয়েছে বলেই ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে। এর জন্যই বিগত সাত বছরে বাংলার কৃষকদের আয় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে

চিঠি লিখে জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরপর চার বার কৃষি কর্মণ পুরস্কার পেয়েছে। স্কুলের পড়া বন্ধ করে নাবালিকার বিয়ে দেওয়া বাংলার গ্রামাঞ্চলে আকছার হচ্ছিল। সেটা বন্ধ করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যাশ্রী প্রকল্প নিয়ে আসেন। ৪ বছর হল। এই চার বছরে কন্যাশ্রী গ্রামাঞ্চলে সাড়া ফেলে দিয়েছে। মুর্শিদাবাদ, মালদহের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলার গ্রামগুলোয় স্কুলছুট ছাত্রীর সংখ্যা অনেকটা কমেছে। নাবালিকা বিয়ের সংখ্যাও কমেছে। কন্যাশ্রী যোদ্ধা, কন্যাশ্রী ক্লাব খোঁজ রাখে কোন গ্রামে নাবালিকার বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিডিও, থানার আইসি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের বিগত চার বছরে একটা কাজ হল— খবর পেয়েই নাবালিকা বিবাহ বন্ধ করতে সেই বাড়ি ছুটে যাচ্ছেন। বাবা-মায়েদের বোঝাচ্ছেন। শুধু কাজটা বেআইনি বলেই দায় সেরে দিচ্ছেন না। বাবা-মায়েরা রাজিও হচ্ছেন। নাবালিকা বিয়ের সংখ্যা অনেকটা কমেছে। সেই নাবালিকা পড়ছে কন্যাশ্রীর টাকায়। আর সবুজসাথীর সাইকেলে চড়ে স্কুলে যাচ্ছে। কিন্তু তার পড়া যাতে বন্ধ না হয় সে জন্যই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যাশ্রী-১ প্রকল্পের পর কন্যাশ্রী-২ এবং ৩ প্রকল্প তৈরি করেছেন। সেই নাবালিকা যুবতী হলেন, কলেজে পড়ছেন। বিয়ের বৈধ বয়সও হয়েছে। এইবার বিয়ে হতে পারে। কিন্তু অভাবী সংসার। চিন্তা নেই, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের কথা ভেবেই ২০১৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে চালু করলেন নতুন প্রকল্প রূপশ্রী। কন্যাশ্রী থেকে রূপশ্রী একটা প্রকল্পের ধারাবাহিকতা। একটা গরিব পরিবারের মেয়ে মাথা উঁচু করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারলেন। বামফ্রন্ট সরকার যেমন ভূমি সংস্কারের পরবর্তী ধাপ ভাবতে পারেনি বলে সংস্কার আটকে গেছে, মা-মাটি-মানুষ-এর সরকার কিন্তু প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই দূরদর্শিতা দেখিয়েছে। প্রতিটি প্রকল্প চালুর পর কী অবস্থা দাঁড়াবে, তখন কী করণীয় তা ভেবেছে। এটাকেই বলে উন্নয়নের প্রকল্পে দিশা আছে, আবার দিশার জন্যই উন্নয়নের প্রকল্পগুলি সফল হয়েছে।

শিশু মৃত্যুর হার বাংলায় আজ অনেকটা কমেছে। এখন প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫। জাতীয় গড়ের তুলনায় ভালো এবং যেভাবে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কমছে আনন্দের সঙ্গে একদিন দেখা যাবে তা শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এই শিশুমৃত্যুর হার কমাতে গেলে প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রসূতি মায়েদের একটু ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা পরিবারেই করা হয়। কিন্তু প্রত্যন্ত

গ্রামাঞ্চলে পরিবারগুলিতে তেমন আচরণ দেখা যায় না। মুখ্যমন্ত্রী এঁদের স্বাস্থ্যের দেখভাল করার জন্য আইসিডিএস ও আশা কর্মীদের বারবার করে সক্রিয় থাকতে বলেছেন। বাড়িতে দাই মায়ের মাধ্যমে সন্তান প্রসব না করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সন্তান প্রসবের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী খুবই কড়া মনোভাব দেখিয়েছেন। কাজও হয়েছে। বহু জেলায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সন্তান প্রসবের সংখ্যা প্রায় ১০০ শতাংশ ছুঁতে চলেছে। আবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসূতি মায়েদের নিয়ে যাওয়ার জন্য মা-মাটি-মানুষ-এর সরকার চালু করেছে মাতৃযান অ্যাম্বুলেন্স। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মতো নদীমাতৃক জেলায় চব্বিশটি অত্যাধুনিক মাতৃযান প্রসূতি মায়েদের নিয়ে ছুটছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। মাতৃযানের জন্য প্রসূতি মায়ের পরিবারকে একটি পয়সাও দিতে হয় না। সন্তান প্রসব থেকে সব ধরনের চিকিৎসাই একদম বিনামূল্যে হচ্ছে। এর ফলেই তো শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। নারকেলডাঙার বিসি রায় শিশু হাসপাতালে চব্বিশ ঘণ্টায় ২০-২২টি শিশুমৃত্যুর ঘটনা এখন অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মাতৃযান অ্যাম্বুলেন্স প্রকল্পকে কেন্দ্র করে বোঝা যায় মা-মাটি-মানুষ-এর সরকারের ভাবনা-চিন্তায় কতটা দূরদর্শিতা আছে।

উন্নয়নের প্রকল্প সব রাজ্য সরকারই কিছু না কিছু করে। কিছু দিন পরেই দেখা যাবে কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান সরকার অন্য রাজ্যের সংবাদপত্রেও বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাবে তারা কত উন্নয়ন করেছে। কিন্তু উন্নয়নের গণমুখী দিশা এবং দিশায় উন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গের মতো কোনও রাজ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। একটা প্রকল্প মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করে সচিবালয় থেকে ঘোষণার মাধ্যমে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া হয় তাকে বলে আধা খ্যাচড়া উন্নয়ন। একটা মাটির রাস্তায় মোরাম ফেলা হল। হয়ে গেল উন্নয়ন। কিন্তু বিগত ৮০ মাসে পশ্চিমবঙ্গে মা-মাটি-মানুষ-এর সরকার এইরকম আধা খ্যাচড়া কাজ করেনি। ৮০ মাস বলছি এই কারণে, রাজ্য সরকারের বয়স ৮২ মাস হল। প্রথম দু-মাসে সরকার ব্যাপক উন্নয়নযজ্ঞে নামবে বলে ভাবনা-চিন্তা, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়েছে। তারপরেই শুরু হয়েছে কাজ। বাস থেকে নেমে গ্রামের বাড়িটা হয়তো দেড়-দু কিলোমিটার দূরে। মেঠো রাস্তায় শুধু মোরাম দিলে তাতে বড়োজোড় সাইকেল ভ্যান যেতে পারে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এমন কাজ হয়েছে। এই আমলে কী হচ্ছে? সেই মোরামের রাস্তায় পিচ ঢেলে সাত-আট কিলোমিটার দূরের আর একটা বাস রাস্তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, গ্রামবাংলায় গেলেই

এমন রাস্তা দেখা যাবে। তার ফলে সাইকেল ভ্যানের বদলে সেখানে অটো চলছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইংরেজিতে যাকে বলে কানেক্টিভিটি, বেড়ে গেলেই অর্থনীতির চলাচল বেড়ে যায়। আশেপাশের গ্রামের মানুষের হাতে অর্থ আসে। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়। এমন উন্নয়নকে বলা হয় স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থানমুখী উন্নয়ন। বিগত ৮০ মাসে মা-মাটি-মানুষ-এর সরকার গ্রামবাংলায় অনেক গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করেছে। ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী ড. অমিত মিত্র বলেছেন, 'এই সরকারের আমলে ২,৭৬২টি নতুন রাস্তার প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩,৪১৭ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে।' অর্থমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'পূর্ত দফতর বিভিন্ন জেলা পরিষদ এবং মিউনিসিপ্যালিটির ৩,১০০ কিমি দীর্ঘ ৩৪৫টি রাস্তাকে উন্নত করার কাজ হাতে নিয়েছে।

গ্রাম, শহর সর্বত্র মহিলা, পুরুষ সব ধর্ম, বর্ণ সবার জন্য উন্নয়নের প্রকল্প হয়েছে এবং শুধু প্রকল্প ঘোষণা করেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য, সব দফতরের সচিবদের নিয়ে শুধু জেলাসদর নয়, মহকুমা তো বটেই এমনকি মেমারি, ডেবরা, গুড়াপের মতো ব্লকে গিয়েও প্রতিটি প্রকল্প ধরে ধরে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তার তদারকি করেছেন। এই প্রশাসনিক বৈঠকই হল ইউনিক আইডিয়া। সামনে বসে থাকা জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, সব মহকুমাশাসক, সব বিডিও, জেলা সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান, বিধায়ক, পুরপ্রধান, পুলিশ সুপার, থানার আইসি, বিভিন্ন দফতরের জেলাস্তরের আধিকারিক এমন সকলকে নাম ধরে ডেকে কোন প্রকল্প রূপায়ণে কী সমস্যা আছে তা বলতে বলেন। তেমন প্রশাসনিক বৈঠকের খবর রাজ্য কেন ভিন রাজ্যের মানুষ এমনকি বিদেশে বসবাসকারী বাঙালিরাও টিভির মাধ্যমে ঘরে বসে দেখছেন। ই-গভর্ন্যান্সের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের এমন স্বচ্ছতা ভারতের কোনও রাজ্যে দেখা যায়নি। মানুষের জন্য কাজ করার সদিচ্ছা এবং কষ্ট করে অর্থ জোগাড় করে মানুষের আয় বৃদ্ধির জন্য একটার পর একটা প্রকল্প ভেবে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, তার নিবিড় তদারকি ভারতের বাকি ২৮টি রাজ্যের কোথাও হয় না। বাংলাতেও এর আগে কোনওদিন দেখা যায়নি। বামফ্রন্ট নেতারাও এখন ঘরে বা পার্টি অফিসে বসে মাঝে মধ্যে প্রশাসনিক বৈঠকের খবর দেখে নিশ্চয়ই ভাবেন তাঁদের আমলে কেন এমনটি হয়নি। প্রসূতি মায়ের দেখভাল, সদ্যোজাত শিশুর সাথী হওয়া থেকে একজন বাংলাবাসীর মৃত্যুর পর শ্মশানে বা কবরস্থানে শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সমব্যথী প্রকল্পে সরকারের ২ হাজার টাকা যে কতটা কাজে লাগে তা ভুক্তভোগীরা বুঝেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন বাংলাবাসীর পাশে থেকে রাজ্য সরকার তাঁকে সাপোর্ট দেয়। এই সাপোর্টের মূল্য অনেক। এই সাপোর্ট দেখে বোঝা যায়, সরকারের দিশায় আছে উন্নয়ন আবার কাজের তদারকি করতে গিয়ে বোঝা যায় উন্নয়নেরও আছে দিশা।

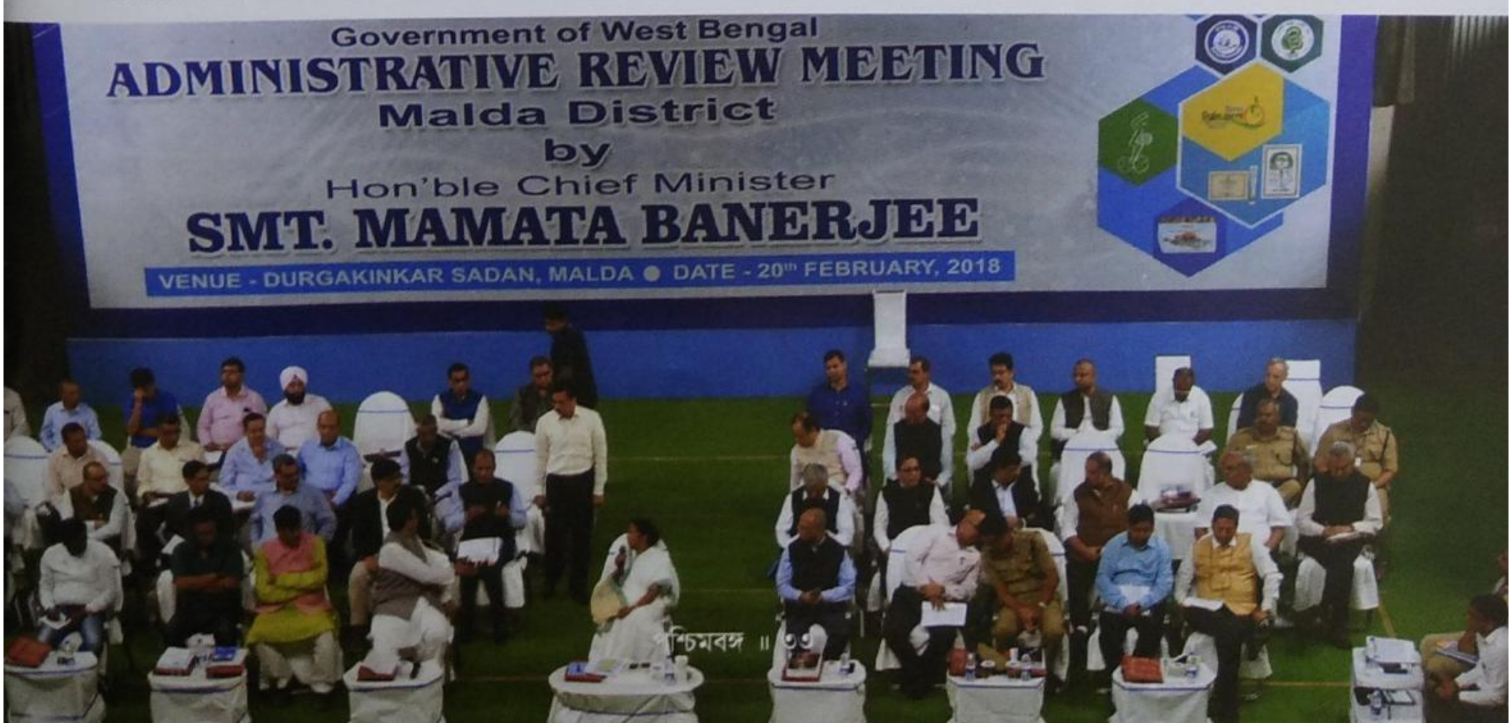

সংবাদ শিরোনামে

১২/০২/২০১৮

নদিয়া জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী ইস্কন মন্দির পরিদর্শনে যান। তিনি জানান,মায়াপুরে ইস্কন বিশ্ব পর্যটনকেন্দ্র স্থাপন করতে চলেছে এবং রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সব সাহায্য করবে এই প্রকল্পে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণনগর রওনা হয়ে যান, পথে চৈতন্য মঠ, চাঁদ কাজির মাজারও পরিদর্শন করেন।

কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলা-প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী জানান, ব্লক থেকে মহকুমা থেকে জেলা থেকে রাজ্য সচিবালয় পর্যন্ত যে সরাসরি সংযোগ ও প্রকল্প রূপায়নে প্রশাসনের সমস্ত স্তরের দেখভালের ফলে সরকারি প্রকল্পগুলি সঠিক সময়ে শেষ হচ্ছে। উপকৃত হচ্ছেন মানুষ। এর ফলে গতি এসেছে রাজ্য প্রশাসনে।

১৩/০২/২০১৮

দুদিনের নদিয়া সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী এদিন কৃষ্ণনগরে এক পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে রাজ্য জুড়ে নতুন ১৩০০ কিমি গ্রামীণ রাস্তার নির্মাণের প্রকল্পের সূচনা করেন।

১৫/০২/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী জঙ্গলমহলে। নব গঠিত জেলা ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়িতে এক সরকারি অনুষ্ঠানে শতাধিক প্রকল্পের উদ্‌বোধন এবং শিলান্যাস করেন। সাধারণ মানুষের হাতে সরকারি পরিষেবা তুলে দেওয়া হয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী শিলদা ইএফআর ক্যাম্পে গিয়ে নিহত জওয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। প্রসঙ্গত, ৮ বছর আগে আজকের দিনে শিলদা ইএফআর ক্যাম্পে হামলা চালায় সশস্ত্র মাওবাদীদের এক বিশাল বাহিনী, সেই আক্রমণে ২৪জন ইএফআর জওয়ান নিহত হন।

১৬/০২/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী ঝাড়গ্রাম জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জেলার সার্বিক উন্নয়নের গতি প্রকৃতি খতিয়ে দেখা হয় এদিনের বৈঠকে।

১৯/০২/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদে এদিন বহরমপুরে এক সরকারি অনুষ্ঠানে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন। স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ ও সড়কসহ জেলার সার্বিক উন্নয়নে আরও দ্রুততা আনতে সহায়ক এই সরকারি প্রকল্পগুলি উদ্বোধনের পাশাপাশি সহস্রাধিক মানুষের হাতে সরকারি পরিষেবা তুলে দেন তিনি। এরপর জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করে উন্নয়ন কার্যের খতিয়ান নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী।

২০/০২/২০১৮

সফরের দ্বিতীয় দিনে মালদায় এক সরকারি পরিষেবা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী পরিকাঠামো, সড়ক যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, স্বনির্ভরতা ছাড়াও বিবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা

করেন। এর পাশাপাশি বেশ কিছু পরিষেবাও প্রদান করেন তিনি। এরপর জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করে উন্নয়ন কার্যের খতিয়ান নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী।

২১/০২/২০১৮

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী।

দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে, পূর্ণ মর্যাদায় পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরে, এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিন এক সরকারি পরিষেবা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নানাবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা করেন তিনি। প্রায় ১০ হাজার মানুষকে সরকারি পরিষেবাও প্রদান করেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করার কথাও এদিন ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর, জেলা ও রাজ্যস্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে রায়গঞ্জে, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জন্যে প্রশাসনিক বৈঠক করেন তিনি। সাধারণ মানুষের কাছে সময়মতো সরকারি পরিষেবা পৌঁছচ্ছে কিনা, উন্নয়নের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে কিনা এই সকল বিষয়ে খোঁজখবর নেন তিনি এদিনের বৈঠকে।

২২/০২/২০১৮

সফরের চতুর্থ দিনে উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে এক সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে পরিকাঠামো সড়ক, সেতু, স্বনির্ভর প্রকল্পসহ একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। নিঃসন্দেহে, জেলাকে সার্বিক উন্নয়নের পথে আরও খানিকটা এগিয়ে দেবে এই প্রকল্পগুলি। জেলার সহস্রাধিক মানুষের হাতে এদিন সরকারি পরিষেবা তুলে দেন তিনি।

২৭/০২/২০১৮

যাত্রা, বাংলার এক ঐতিহ্যময় বিনোদন। এদিন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের কাছারি ময়দানে ২২তম যাত্রা উৎসবের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা অ্যাকাডেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই যাত্রা উৎসব। রাজ্যের বিভিন্ন মঞ্চে ৩২ দিন ব্যাপী এই যাত্রানুষ্ঠান চলে। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিনোদন দিয়ে চলেছে গ্রাম বাংলার এই যাত্রাপালা। যাত্রা জগতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এদিন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে 'শান্তিগোপাল-তপনকুমার' সম্মান প্রদান করা হয়।

বারাসাতের কাছারি ময়দানে এক সরকারি অনুষ্ঠানে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। বড় সংখ্যক উপভোক্তা পান সরকারি পরিষেবা। এর আগে ব্লক ও রাজ্য স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে উন্নয়ন কার্যের খতিয়ান নেন মুখ্যমন্ত্রী।

০৫/০৩/২০১৮

পশ্চিম বর্ধমান জেলা সফরে, এদিন দুর্গাপুরে ব্লক ও রাজ্য স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। উন্নয়নের অগ্রগতির খবরাখবর নেওয়া ছাড়াও পরিষেবা সময়মত মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে কিনা সে বিষয়েও আলোচনা হয় এদিনের বৈঠকে।

আজ পুরুলিয়া জেলার শিমুলিয়াতে এক সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংস্কার, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, নতুন রাস্তা, নলকূপ প্রকল্প, নদী সেচ প্রকল্প, রেশম ভবনসহ বিবিধ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। এছাড়া যে সকল প্রকল্পের শিলান্যাস করেন, তার কয়েকটি হল গুদাম ঘর, কর্মতীর্থ, প্রশাসনিক ভবন, আলোক স্তম্ভ ইত্যাদি। এর পাশাপাশি তিনি

কন্যাশ্রী, সবুজশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজসাথী, সমাজসাথী, গতিধারা, পাট্টা, সয়েল হেলথ কার্ড, পাওয়ার টিলার ইত্যাদি পরিষেবাও প্রদান করেন।

০৬/০৩/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এদিন পুরুলিয়া জেলার ব্লক ও জেলা স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করেন। সরকারি পরিষেবার সুষ্ঠু বিতরণ ও উন্নয়ন কার্যের অগ্রগতি— এই ছিল বৈঠকের আলোচ্য বিষয়।

এদিন বাঁকুড়া জেলার কাঁকড়ডাঙা, পাত্রসায়েরে সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। মুখ্যমন্ত্রী যে সকল প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন, তার কয়েকটি হল, ফেয়ার প্রাইস মেডিসিন শপ, ধানের গুদাম, নতুন রাস্তা, মিনি ইনডোর গেমস কমপ্লেক্স, খালের সংস্কারসহ নানাবিধ। এছাড়া তিনি যে সকল প্রকল্পের শিলান্যাস করেন, তার কয়েকটি হল, ইকো পার্ক, শ্রম ভবন ইত্যাদি। এর পাশাপাশি তিনি কন্যাশ্রী, সবুজশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজসাথী, আনন্দধারা, গতিধারা, ধামসা মাদল, কৃষি যন্ত্রপাতি, সবজি চাষের মিনিকিটসহ বেশ কিছু পরিষেবা প্রদান করেন।

০৯/০৩/২০১৮

পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে, রাজ্যের মুকুটে যুক্ত হল এক নতুন পালক, গার্ডেনরিচ ফ্লাইওভার। এদিন গার্ডেনরিচ সেতুর উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। ৪.৪ কিমি দীর্ঘ, ৪ লেনযুক্ত এই সেতু নিঃসন্দেহে উদ্দীষ্ট এলাকার দীর্ঘস্থায়ী যানজট সমস্যার সমাধান ঘটাবে। এছাড়া নতুন পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে আরও ৮টি নতুন ফ্লাইওভার নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা আগামী দিনে শহরের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে।

১৩/০৩/২০১৮

শৈল শহরের ইতিহাসে নিশ্চিত ভাবেই এই দিনটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে কারণ পাহাড়ে প্রথম শিল্প সম্মেলন। দার্জিলিং শহরে এই শিল্প সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এছাড়া, মন্ত্রীসভার মাননীয় সদস্য ও জিটিএ-র কার্যনির্বাহীবৃন্দ ও বিভিন্ন দফতরের সচিবসহ বিভিন্ন বণিক সভার মুখ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে। পাহাড়ে পর্যটন, চা, পরিবহণ শিল্পের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি, উদ্যান-পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, হস্তশিল্প, ফুলচাষ, ভেষজ উদ্ভিদ-সহ অন্যান্য কৃষি সম্পর্কিত ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনার দিকগুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই শুরু হয় শিল্প সম্মেলন। এই সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিষয়ে আশাব্যঞ্জক আলোচনার ফলে পাহাড়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আশাপ্রকাশ করেন যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে পাহাড়ের মানুষ আরও উন্নয়নের পথে হাঁটবে।

১৪/০৩/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী এদিন ঘোষণা করেন যে দেশের মধ্যে বাংলা এবারও শীর্ষে, শিল্প গড়ার সুবিধার দিক থেকে। এই তথ্য জানিয়েছে ভারত সরকারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি এন্ড প্রমোশন দফতর। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে জানান যে রাজ্য সরকারের তীক্ষ্ণ নজরদারি থাকে সচিব স্তর থেকে একেবারে প্রশাসনের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত। কোনও শিল্প উদ্যোগী যেন বিনিয়োগ করতে এসে কোনভাবেই কোনও অসুবিধার সম্মুখীন না হন, তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করা হয়। রাজ্যের এই সাফল্য প্রমাণ করে বাংলাই বিনিয়োগের জন্য এই মুহূর্তে দেশের মধ্যে আদর্শ।

পাহাড়ের শিল্প সম্মেলনের শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী জানান যে মোটের উপর ২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, ও মিরিকে নতুন করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ইকো

ট্যুরিজম, চা-পর্যটন, ভেষজ উদ্ভিদ চাষ, হস্তশিল্প, কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন শিল্পের বিনিয়োগের সূচনা হতে চলেছে। এছাড়া মাটিগাড়াকে পাহাড়ের প্রবেশদ্বার হিসাবে ঢেলে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে পাহাড়ের বুকে বিপুল কর্ম সংস্থান হবে, পাহাড়ের আগামী প্রজন্ম নতুন উদ্যোমে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচবে, পাহাড়ে সমৃদ্ধি স্থায়ী হবে।

১৬/০৩/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী ও সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিং এক বৈঠকে বসেন শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের সচিবালয় উত্তরকন্যায়। বৈঠকে দুই রাজ্যের নানান বিষয়সহ দার্জিলিং পাহাড় ও সিকিমের মধ্যে পরিবহণ সমস্যা মেটাতে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী জানান যে সিকিম আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য, সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে দুই রাজ্যই যৌথ পদক্ষেপ করবে। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চামলিং-এর বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রীর কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনি আরও জানান যে শৈল শহরে আগামী বাণিজ্য সম্মেলনে শ্রী চামলিং-কে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সিকিমের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে সিকিমে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আগামীদিনে সরকারি সফরে সিকিম যাবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

২০/০৩/২০১৮

হুগলি ও পূর্ব বর্ধমান জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এদিন হুগলি জেলার গুরাপে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। জেলা স্তর থেকে ব্লক পর্যন্ত প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী জেলার সার্বিক উন্নয়নের খোঁজ নেন। এরপর বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী গুসকরায়। পূর্ব বর্ধমান জেলারও জেলাস্তর থেকে ব্লক পর্যন্ত আধিকারিকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে উন্নয়নের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেন। জেলাভিত্তিক এই রিভিউ মিটিং-এ রাজ্য স্তরের সচিবরাও উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনায় বিগত ৬ বছরের বেশি সময় ধরে এই ভাবেই রাজ্য প্রশাসন সাধারণ মানুষের স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে জেলা ভিত্তিক পর্যালোচনা বৈঠকের আয়োজন করেছে। তার ফল সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন পরিষেবা থেকে জেলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে।

২১/০৩/২০১৮

জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী যান পশ্চিম মেদিনীপুরে। ডেবরাতে এক সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে শতাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা করে সাধারণ মানুষের হাতে বিভিন্ন পরিষেবাও তুলে দেন তিনি। এর আগে বোলপুরে তিনি বীরভূম জেলার জন্য প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করেন। উন্নয়নের অগ্রগতি ও সরকারি পরিষেবার সুষ্ঠু প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠক।

২২/০৩/২০১৮

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী মেদিনীপুরের পুলিশ লাইনস-এ জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি । জেলা স্তর থেকে ব্লক পর্যন্ত প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী জেলার সার্বিক উন্নয়নের খোঁজ নেন।

২৬/০৩/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে বসেন পৈলানে ভারত সেবাশ্রমের অডিটোরিয়ামে। জেলার উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়নের খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী ব্লক স্তর থেকে জেলা স্তরের আধিকারিকদের কাছ থেকে। এছাড়া জেলার নানান প্রশাসনিক বিষয়ে জেলাশাসক-সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেন।

০২/০৪/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী এদিন জানান যে নোটবন্দীর নানান কুফল এবং তড়িঘড়ি জিএসটি লাগু করার ফলে অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়া সত্ত্বেও রাজ্যের আর্থিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য এসেছে। ২০১৭-১৮ আর্থিক বর্ষে পরিকল্পনা খাতে রাজ্যের অগ্রগতি বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। চলতি আর্থিকবর্ষে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে যাবার মতো ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে। আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১ % কিন্তু রাজ্য সরকারের স্থিতধী পর্যালোচনা এবং ক্রমাগত কার্যকরী পদক্ষেপের ফলে ১৬.৫% আর্থিক বিকাশ ঘটেছে পরিকল্পনা খাতে। ২০১৬-১৭ সালে ৪৯,৬০৯ কোটি টাকা এবং ২০১৭-১৮ সালে ৫৭,৭৭৮.৬০ কোটি টাকার উত্তরণ নিশ্চিত ভাবেই রাজ্যের আর্থিক বিকাশের সুনিশ্চিত সংকেত। মুখ্যমন্ত্রী এদিনের বার্তায় আরও জানান যে এই বিকাশের পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে ২০১০-১১ সালের (১১,৮৩৭.৮৫ কোটি টাকার) নিরিখে প্ল্যানড এক্সপেন্ডিচার ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৯%। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের ১২,০২৮.৫০ কোটি টাকা থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বর্ষে ১৯,০৮৪.৭০ কোটিতে পৌঁছেছে। ২০১০-১১ সালের তুলনায় ২০১৭-১৮ সালে বৃদ্ধির পরিমাণ সাড়ে আট গুণ। এছাড়া, রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব আদায়ের বৃদ্ধির পরিমাণও বেশ উল্লেখযোগ্য। ২০১৭-১৮ আর্থিক বর্ষে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৫২,৯৭১ কোটি টাকা। বিগত ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে এর পরিমাণ ছিল ৪৫,৬৪৭ কোটি টাকা। বৃদ্ধির পরিমাণ ৭,৩০০ কোটি টাকা। আর্থিক ক্ষেত্রে এই মাত্রাতিরিক্ত সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে চারশ'র বেশি প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক এবং রাজ্য,জেলা, ব্লক স্তরের পরিষেবা প্রদান।

০৩/০৪/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী জানান, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ১০০দিনের কাজে সারা দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছে পশ্চিমবঙ্গ। ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের রাজ্যে ৩০.৯৮ কোটি শ্রমদিবস তৈরি হয়েছে, সমগ্র দেশে যা সর্বোচ্চ। এছাড়া, ২০১৭-১৮ আর্থিক বর্ষে ৮০০৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পটিতেও দেশের মধ্যে এগিয়ে আছে বাংলা। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে গড় শ্রম দিবসের নিরিখে ৫৯ দিন কাজ হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি থেকে দেশের বিভিন্ন বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীর বিগত ২০১৪-১৫ আর্থিকবর্ষ থেকে ২০১৭-র সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৯১১ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণের প্রভাব দেশের ব্যাঙ্ক শিল্পে পড়েছে। এইদিন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে যে কমবেশি এই ২লক্ষ ৪২ হাজার কোটি টাকার ঋণ সরাসরি মুকুব বা 'রাইট অফ' করে দেওয়া হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে কৃষি ঋণের চাপে দেশে কৃষকের আত্মহত্যার মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে সেই দিকে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও ভ্রূক্ষেপ করছে না। কৃষি ঋণ মুকুবের কোনও সরকারি ঘোষণা আজও হয়নি। এই বিপুল টাকা কাদের কাছে ঋণ দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে, সে সব ঋণ খেলাপিদের নাম প্রকাশ্যে আনার জন্য তীক্ষ্ণ ভাষায় দাবি তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে রাজ্যসভায় জানানো হয়েছে ঋণ খেলাপিদের নামের তালিকা অর্থাৎ কাদের ঋণ তারা মুকুব (রাইট অফ) করছে, সেই তালিকা কোনও ভাবেই প্রকাশ করা হবে না।

২০/০৪/২০১৮

সিভিল সার্ভিস দিবস পালিত হল কলকাতার আলিপুরের ' উত্তীর্ণ ' মঞ্চে। গত বছর ২০১৭ সালে রাজ্যে প্রথম সিভিল সার্ভিস দিবস পালন করা শুরু হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন যে রাজ্যের সিভিল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে

সরকারের জনহিতকর কর্মসূচী ও প্রকল্পের রূপায়নে। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আদতে উপকৃত হন সাধারণ মানুষ। রাজ্যের উন্নয়নে গতি আনার ক্ষেত্রে সিভিল সার্ভিসের সদস্যরা বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তাই, রাজ্যের সকল আইএএস, আইপিএস এবং রাজ্যের সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের এদিন অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী।

২১/০৪/২০১৮

জিএসটি আদায়ে জাতীয় গড়কে ছাপিয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী জানান, জিএসটি আদায়ের সাফল্যের পাশাপাশি রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান কমানোর নিরিখেও রাজ্যকে অভিনন্দন জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। মার্চ মাসের হিসাব অনুযায়ী রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান যেখানে গোটা দেশে কমে দাঁড়িয়েছে ১৭.৯ শতাংশ, সেখানে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই তা কমে দাঁড়িয়েছে তিন শতাংশেরও কম।

পঞ্চায়েতের কাজের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গকে সেরার স্বীকৃতি দিল কেন্দ্রীয় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের কাজের সাফল্যে তিনি গর্বিত। ভবিষ্যতেও এভাবেই রাজ্যকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা ও তার সার্থক রূপায়নের কর্মসূচি।

০১/০৫/২০১৮

ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এদিন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে শপথ নিলেন। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জীসহ মন্ত্রীসভার আরও কয়েকজন সদস্য।

০২/০৫/২০১৮

গান্ধিজির ১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালন করার জন্য কর্মসূচি রূপায়নের উদ্দেশ্যে এদিন দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ।

দিল্লি সফরে কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী পীযুষ গোয়েলের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এই বৈঠকে দেওচা-পাচামি অঞ্চলের খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের সূচনা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হয়।

২১/০৫/২০১৮

নজরুল মঞ্চে সেদিন যেন চাঁদের হাট। মধ্যমণি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতি বছরের মতো এবছরও রাজ্যের দুই শ্রেষ্ঠ নাগরিক সম্মান প্রদান করা হল। ২০১১ সালে নতুন রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর শুরু হয় এই সম্মানা প্রদান অনুষ্ঠান।

বঙ্গবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হলেন—আশা ভোঁসলে, শ্যামল কুমার ভৌমিক এবং গিরিজা শঙ্কর রায়।

বঙ্গভূষণ সম্মানে ভূষিত হলেন—শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী হোম চৌধুরী এবং পার্থ ঘোষ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান সচিব বিবেক কুমার নিজে বিশিষ্ট কথকশিল্পী পণ্ডিত বিরজু মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাতে বঙ্গবিভূষণ সম্মাননা তুলে দেবেন। তিনি বলেন, তাঁর লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গকে সবদিক থেকে বিশ্বশ্রেষ্ঠ করে তোলা এবং সেই লক্ষ্যেই তিনি ও তাঁর সরকার কাজ করছে।

নদিয়া জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী
১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

ঝাড়গ্রাম সফরে মুখ্যমন্ত্রী
১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

জেলা সফরে মুর্শিদাবাদ
১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

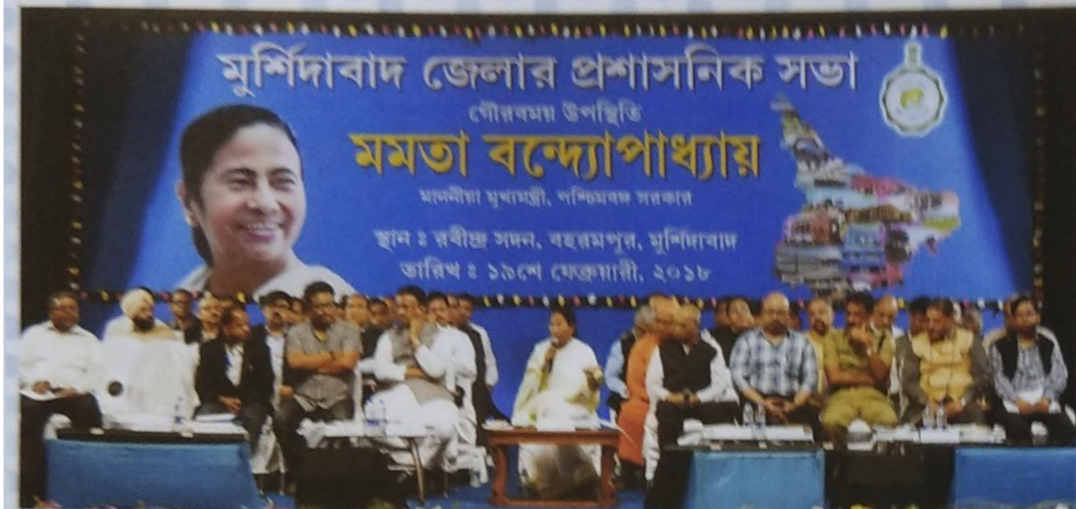

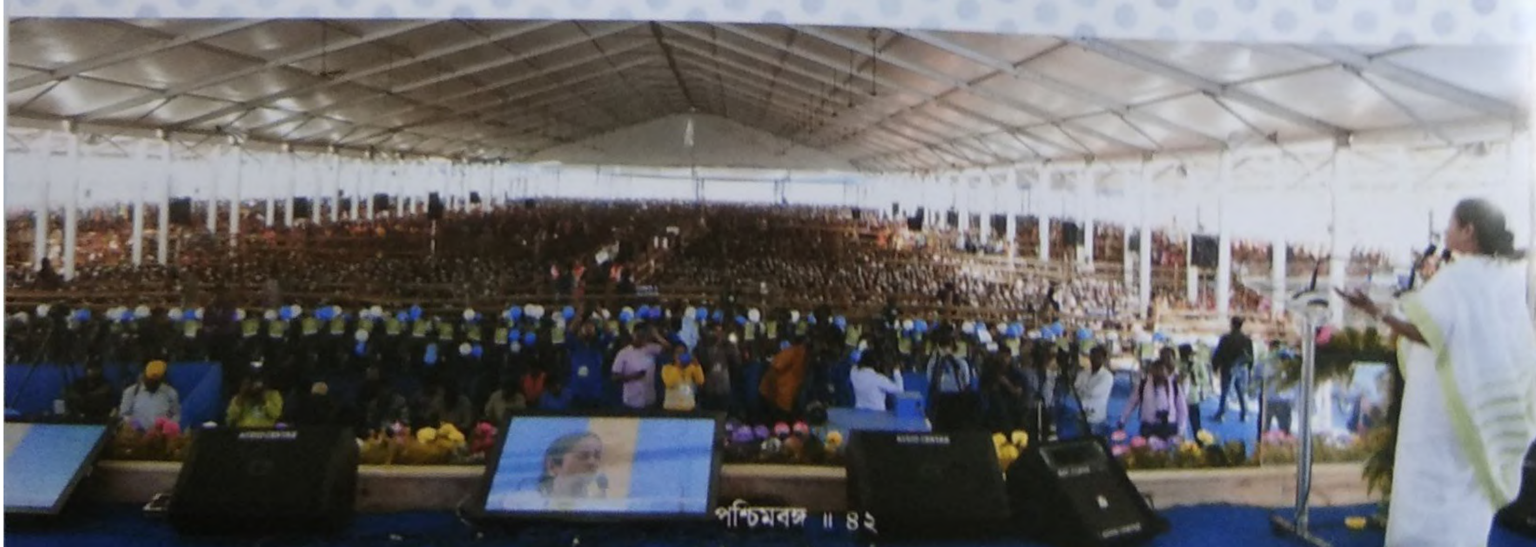

মালদা জেলা সফর
২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর
২১-২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

উত্তর ২৪ পরগনা

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

যাত্রা উৎসবের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী

বারাসাত, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

নতুন জেলা পশ্চিম বর্ধমান সফরে
৫ মার্চ, ২০১৮

বাঁকুড়া-পুরুলিয়া সফরে মুখ্যমন্ত্রী
৬ মার্চ, ২০১৮

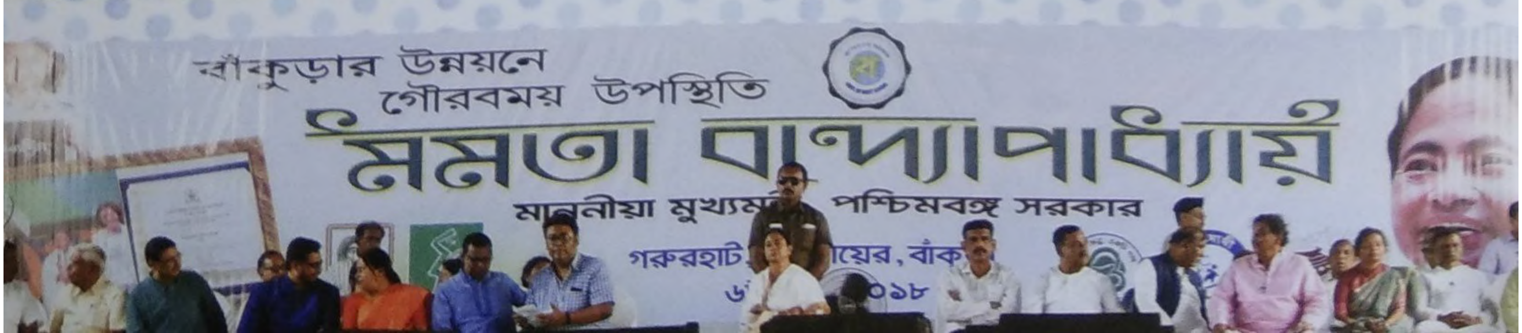

হুগলি জেলা সফরে
২০ মার্চ, ২০১৮

পূর্ব বর্ধমানে মুখ্যমন্ত্রী
২০ মার্চ, ২০১৮

বীরভূম সফরে
২১ মার্চ, ২০১৮

পশ্চিম মেদিনীপুরে মুখ্যমন্ত্রী
২১-২২ মার্চ, ২০১৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
এর উপস্থিতিতে
প্রশাসনিক বৈঠক
স্থান ঃ মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃঃ তারিখ ঃ ২২শে মার্চ, ২০১৮

কেবল অপারেটারদের সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী
২০ এপ্রিল, ২০১৮

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান
১০ মে, ২০১৮

সিভিল সার্ভিস ডে
২০ এপ্রিল, ২০১৮

গান্ধিজির জন্মের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন নিয়ে নবান্নে বৈঠক
২০ এপ্রিল, ২০১৮

নবান্ন সভাগৃহে প্রশাসনিক বৈঠক
ও 'উপান্ন'-র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
৮ মে, ২০১৮

রবি-কবির স্মরণ অনুষ্ঠান
৯ মে, ২০১৮

ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রকাশিত হল মুখ্যমন্ত্রীর বই

২৭ এপ্রিল, ২০১৮

ইরাকে নিহতের পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী

বঙ্গবিভূষণ ও বঙ্গভূষণ সম্মাননা প্রদান

২১ মে, ২০১৮

ছবি: প্রতীক শেঠ ও সঞ্জয় সমাদ্দার

'টাইম' পত্রিকা

সেরা ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় মুখ্যমন্ত্রী

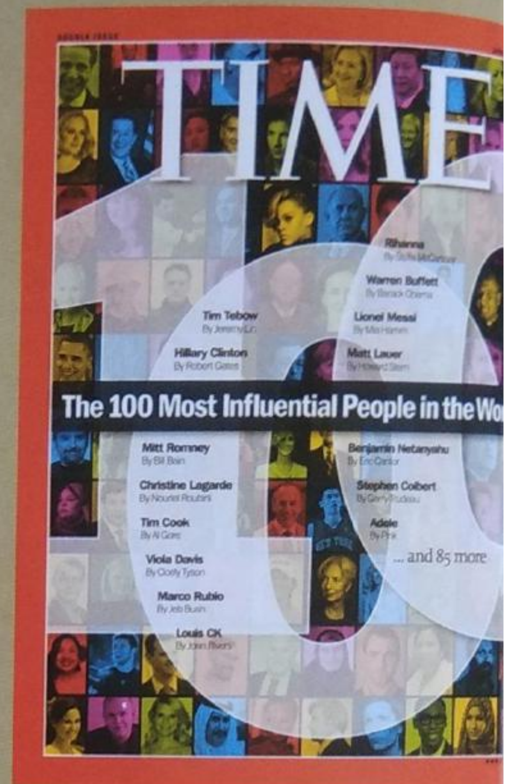

প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা কিংবা হিলারি ক্লিন্টন থেকে বিশিষ্ট শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারী ওয়ারেন বাফ। এঁদের সঙ্গেই এক তালিকায় উঠে এসেছেন রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। ২০১২-র ১৮ এপ্রিল তারিখে এই তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এ থেকেই প্রমাণ, বিশ্বের সেরা ১০০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় এবার মুখ্যমন্ত্রীকে যুক্ত করল মার্কিন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'টাইম'।

কিন্তু কেন এই অন্তর্ভুক্তি? বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে ওই পত্রিকায় লেখা হয়, মমতা ব্যানার্জী এবং তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে সাড়ে তিন দশকের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। দীর্ঘ লড়াই শেষে একজন পরিণত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছেন। আর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছিলেন, বাংলার মানুষের ভালবাসাতেই এই সম্মান।

পৃথিবীর অন্যতম নামকরা এই সাপ্তাহিকটির মতে, মমতা ব্যানার্জী ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় নেত্রী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনের গভীরে নিজের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। দিল্লির দরবারেও তাঁর সমান প্রভাব ও আধিপত্য। সাধারণ এক পরিবার থেকে উঠে এসেও যেভাবে একই সঙ্গে রাজ্য এবং জাতীয় রাজনীতির আঙিনায় নিজেকে প্রভাবশালী নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, তা প্রশংসনীয়। অন্যদিকে এই সম্মান প্রসঙ্গে কলকাতার টাউন হলে সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের সঙ্গে ছিলাম-আছি-থাকব।

এরপর 'টাইম' পত্রিকার পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে মার্কিন মুলুকে হাজির হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ২৪ এপ্রিল ছিল এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত সূচি পরিবর্তন করে মুখ্যমন্ত্রী, নিউইয়র্কে হাজির হতে পারেননি। তবে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, ভবিষ্যতে নিউইয়র্ক গেলে তিনি অবশ্যই ওই পত্রিকার দপ্তরে যাবেন।

কলকাতায় হিলারি ক্লিন্টন সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে

'সব বাধা পেরিয়ে যে নারীরা এগিয়ে আসেন, আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহ বোধ করি। তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন। রাজনীতিতে নির্বাচনী অগ্নিপরীক্ষা জয় করা কত কঠিন কাজ, তা আমরা জানি। একই অভিজ্ঞতা আমারও রয়েছে। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমিই কলকাতায় চলে এলাম।'....

জীবনে প্রথমবার কলকাতায় পা রেখে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে একথাই জানিয়ে গেলেন তৎকালীন মার্কিন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিন্টন। দিনটা ছিল ৭ মে, ২০১২। যার প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'ওঁর আসাটা গর্বের মতো ঘটনা। স্বাধীনতার পর এই প্রথম রাজ্যে কোনো মার্কিন বিদেশ সচিব পা রাখলেন। রাজ্য মার্কিন লগ্নির গন্তব্য হতে চলেছে। সব কৃতিত্ব বাংলার মা-মাটি-মানুষের।

প্রসঙ্গত, 'টাইম' পত্রিকায় বিশ্বের ১০০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় মমতা ব্যানার্জী এবং হিলারি ক্লিন্টন দুজনের নামই প্রকাশিত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী-হিলারি ক্লিন্টন বৈঠকে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের সীমানা পেরিয়ে উঠে এসেছিল রাজ্যের উন্নয়ন ও মার্কিন লগ্নির প্রসঙ্গ। তথ্য প্রযুক্তি, উৎপাদন শিল্প, পর্যটন, গভীর সমুদ্র বন্দর, চলচ্চিত্র শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে মার্কিন বিনিয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন হিলারি। মহাকরণে বৈঠকের পাশাপাশি লা মার্টিনিয়ার স্কুল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং আই সি সি আর-এও যান তিনি।

মার্কিন বিদেশ সচিব মুখ্যমন্ত্রীকে রবীন্দ্রনাথের মুখ আঁকা ও 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' গান লেখা সিল্কের আসন এবং মার্কিন প্রথা মেনে 'ফিগ লিফ' অর্থাৎ ১৯টি ব্রোঞ্জের পাতা উপহার দেন। মুখ্যমন্ত্রী হিলারিকে উপহার দেন গীতাঞ্জলি ও গীতবিতানের ইংরেজি অনুবাদ এবং বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের ওপর ইংরেজিতে লেখা দুটি বই, নিজের লেখা বই ও কাঁথা স্টিচের উত্তরীয়।

দপ্তর কথা

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন থেকে রাজ্যের দায়িত্ব নিয়েছেন, উন্নয়নের ধারাকে বাংলার প্রতিটি প্রান্তিক গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছেন। কয়েকটি দপ্তরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরা হল এই প্রতিবেদনগুলিতে।

প্রশাসনিক সংস্কার

শুধু উন্নয়নের ভাবনা-চিন্তা করলেই তো হবে না! রাজ্য সরকারকে তার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতেই হয়। আর এজন্য প্রয়োজন প্রশাসনিক সংস্কার, প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার তৈরি ও সেটা মেনে কাজ করা, লোকবল বৃদ্ধি, সংবেদনশীল প্রশাসন তৈরি, স্বচ্ছ প্রশাসনের লক্ষ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রমুখ দৃঢ় পদক্ষেপ। এই ৭ বছরে রাজ্য সরকারের তরফে যা নেওয়া হয়েছে এবং অনন্য নজির তৈরি হয়েছে। প্রান্তিক গ্রামের মানুষটিকে, নতুন রাজ্য সরকারের আমলে আর নবান্ন বা মহাকরণমুখী হতে হয় না। ঘরে বসেই তিনি সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা পান। আর এটা করতে পেরে গর্বিত মুখ্যমন্ত্রী, গর্বিত রাজ্য সরকার, খুশি রাজ্যবাসী।

নতুন জেলা/মহকুমা/বিভাগ

নতুন ৪টি জেলা-সহ রাজ্যে এখন মোট জেলার সংখ্যা ২৩টি। নতুন ৪টি জেলা হয়েছে—আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান। এছাড়াও খুব শিগগিরিই সুন্দরবন ও বসিরহাটের নদীমাতৃক এলাকার প্রান্তিক মানুষের কথা ভেবে আরো ২টি নতুন জেলা হবে। মালদা ও মেদিনীপুরে হয়েছে আরও ২টি নতুন বিভাগ। এর ফলে রাজ্যে এখন বিভাগের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫টি। অন্যদিকে দার্জিলিং-এর মিরিক, পুরুলিয়ার ঝালদা ও মানবাজারে ৩টি মহকুমা হয়েছে।

প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার/বৈঠক

২০১৪ থেকে প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। যার মূল উদ্দেশ্য হল, প্রতি দপ্তরের ঘোষিত কর্মসূচি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় বা সিএমও থেকে বিডিও পর্যন্ত সংযোগ আরও নিবিড় করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই গত ৭ বছরে রাজ্যে ৩৯৫টি প্রশাসনিক বৈঠক হয়েছে। রাজ্যের সচিবালয়কে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রতি জেলান্তর থেকে একেবারে পঞ্চায়েত পর্যন্ত।

সংবেদনশীল প্রশাসন

নতুন রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্যই হল আরও সংবেদনশীল প্রশাসন। সেজন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও আমলার সংখ্যা বৃদ্ধি। এই ভাবনাকে মূলত মাথায় রেখেই রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপে আইএএস অফিসারের সংখ্যা ৩১৪ থেকে বেড়ে ৩৫৯ জন করা হয়েছে। অন্যদিকে কর্মজীবনে পদমর্যাদা আরও দ্রুত করতে ডব্লুবিসিএস (এক্সি) অফিসারদের বিশেষ সচিবের সংখ্যা ২৫ থেকে ৬০ এবং যুগ্ম সচিবের সংখ্যা ১৪৫ থেকে ২১৫ করা হয়েছে। এই প্রথম রাজ্যে পালিত হয়েছে সিভিল সার্ভিস ডে, ২১ এপ্রিল ২০১৭ থেকে। আবার, সরকারি কর্মচারীর ৭৩০ দিনের মাতৃত্বকালীন ও শিশুযত্নের ছুটির পাশাপাশি ৩০ দিনের পিতৃত্বকালীন ও শিশুযত্নের ছুটির ঘোষণা—এখন এই রাজ্যের একটি মাইলফলক।

নতুন রাজ্য সরকারের সংবেদনশীল প্রশাসনের আরও একটি দিক হল, সরকারি চাকরির বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো। গ্রুপ-এ পদের জন্য বয়স ৩২ থেকে ৩৬ বছর, গ্রুপ-বি পদের জন্য ৩২ থেকে ৩৯ বছর, গ্রুপ-সি ও ডি পদের জন্য বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৪০ বছর করা হয়েছে। এছাড়া তপশিলি জাতি ও আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির পদপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে, নিয়ম অনুসারে ঊর্ধ্বসীমায় ছাড় দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ৫ বছর ও ৩ বছর।

নবান্ন ও উত্তরকন্যা

৫ অক্টোবর, ২০১৩। ডালহৌসির মহাকরণের বাইরে এই প্রথম কাজ করা শুরু করল রাজ্য সরকারের নতুন সচিবালয়। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে জেলাগুলির উন্নয়নের কাজ আরও দ্রুত করার জন্য ২০১৪-র ফেব্রুয়ারি পথ-চলা শুরু করল নতুন শাখা সচিবালয় 'উত্তরকন্যা'। মোট এলাকা ৬০ হাজার বর্গফুট। নতুন রাজ্য সরকার চায়, দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়ে থাকা মহাকরণের আমূল সংস্কার। সেজন্যই বেশ কিছু দপ্তর 'নবান্ন' এবং অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস-ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট-মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব ও ডিজির অফিস ছাড়াও রয়েছে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা, অর্থ, পূর্ত, স্বরাষ্ট্র, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, বিপর্যয় মোকাবিলা ইত্যাদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। এছাড়া নব মহাকরণে আবাসন, বিদ্যুৎ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, খাদ্য ভবনে খাদ্য ইত্যাদি দপ্তরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে আজ, নতুন সরকারের আমলে, শহর জুড়েই যেন মহাকরণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

শিল্পায়নের বার্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ৪ বিদেশ সফর

রাজ্যের দায়িত্বভার কাঁধে নিয়েই তিনি চিন্তিত ছিলেন নতুন প্রজন্মের কর্মসংস্থানের বিষয়ে। বুঝতে পেরেছেন, দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের দরবারে বিশ্ববাংলার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। বিশ্ববঙ্গের বুকে বিশ্বের বিজনেস টাইকুনদের দৃপ্ত উপস্থিতি দেশের শিল্প মননে অন্য বার্তা দেবে। এজন্য প্রয়োজনে তিনি নিজে ছুটে গিয়েছেন তাঁদের কাছে। সিঙ্গাপুর থেকে লন্ডন; আবার ভুটান থেকে জার্মানি। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁর ৭ বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বে বিশ্ববাসীর কাছে বিশ্ববাংলার এই বার্তাই আজ পৌঁছেছে—বাংলা মানে ব্যবসা। বঙ্গ বাণিজ্যের দরবারে বিশ্ববাণিজ্যের প্রতিনিধিরা স্বাগত।

সিঙ্গাপুর সফর (১৭-২১ আগস্ট, ২০১৪)

২০১৪-র ১৭ আগস্ট। ৫ দিনের সফরে, প্রথম সিঙ্গাপুরের পথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটাই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। যে সফর শেষে, ২১ আগস্ট রাজ্যে ফিরে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, সে দেশের প্রত্যেক শিল্পপতি এ রাজ্যে বিনিয়োগে আগ্রহী। শিল্পায়নের ব্যাপারে সদর্থক আলোচনা হয়েছে। ১৩টি মৌ স্বাক্ষর হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সে দেশের শিল্পপতিরা এ-রাজ্যে ক্রমান্বয়ে, ১৫০০ কোটি টাকার বেশি লগ্নি করবে। রাজ্যের শিল্প মানচিত্রে আন্তর্জাতিক লগ্নি টানার ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর সফর ফলপ্রসূ হবে।

প্রথম দিনে আই এন এ স্মরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৪৫-এর ৮ জুলাই নেতাজি এই স্মারক স্তম্ভের শিলান্যাস করেছিলেন। এরপর জুরং বার্ড পার্ক পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজারহাটের ইকো পার্কে ৫ একর জমি নিয়ে গড়ে উঠছে পাখিবিতান।

সফরের দ্বিতীয় দিনে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি শিয়েন লুং-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের পর, তৃতীয় দিন সে দেশের বণিক মহলের সামনে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, বাংলা ও সিঙ্গাপুরের যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় বিজনেস ফোকাস সেন্টার তৈরি হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চেয়ার সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লি কুয়েন ইউ-র নামে তৈরি করতে চান তিনি।

রাজ্যে ফিরে ২৭ আগস্ট সিঙ্গাপুর সফরসঙ্গী প্রায় ৪৫ জন শিল্পপতির সঙ্গে ফের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৯ আগস্ট নবান্নে মালয়েশিয়ার বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

লন্ডন সফর (২৬-২৯ জুলাই, ২০১৫)

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটি দ্বিতীয় বিদেশ সফর। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরনের আমন্ত্রণে মমতা ব্যানার্জীর এই লন্ডন সফর। সেখানে তিনি রাজপরিবারের আমন্ত্রণ ও উষ্ণ আতিথেয়তায় আপ্লুত, কৃতজ্ঞ। ঐতিহ্যময় বাকিংহাম প্যালেসে উপস্থিত ছিলেন ডিউক অব ইয়র্ক প্রিন্স অ্যান্ড্রুজ এবং লর্ড স্পিকার ব্যারোনেজ ডি সুজা। অন্যদিকে এদিন রাজ্য ও ব্রিটেনের শিল্পপতিদের মধ্যে ২১টি মউ স্বাক্ষর হল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি ছিল—শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং নগরোন্নয়ন। লন্ডনের ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ দপ্তরের ঐতিহাসিক লোকার্নো স্যুইটে এই চুক্তিগুলি স্বাক্ষর হয়।

২৮ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের সঙ্গে। এরপর ব্রিটেনের শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতাকে প্রাচ্যের প্রবেশদ্বার বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে রাজ্যে তখন চরম বন্যা পরিস্থিতি। ফলে মুখ্যমন্ত্রী লন্ডন থেকেই রাজ্যের সচিবদের সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলেন, প্রশাসনকে সজাগ থাকতে নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রীর

মন্ত্রিসভার ভারতীয় বংশোদ্ভূত মন্ত্রী প্রীতি প্যাটেল বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে নবজাগরণ ঘটেছে এবং এর সম্ভাবনাগুলি পূর্ণতা পাচ্ছে। আজকের পশ্চিমবঙ্গ তাই গতিশীল।

যে মউগুলি স্বাক্ষর হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিকী শাখায় এবং লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর সঙ্গে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার আকাদেমিক এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম। এছাড়া উল্লেখযোগ্য হল, লন্ডন চেম্বার অফ কমার্স এবং ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের মধ্যে যৌথ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে মউ স্বাক্ষর। আরও বেশি বিনিয়োগ টানতে কলকাতায় গড়ে উঠবে 'ইউকে ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিল' এবং লন্ডনের ক্যানারি হোয়ার্ফ (CANARY WHOARF) এর আদলে রাজারহাটে তৈরি হবে আর্থিক অঞ্চল।

ভুটান সফর (৫-৯ অক্টোবর, ২০১৫)

শিল্পায়নের বার্তা নিয়ে এটি মুখ্যমন্ত্রীর তৃতীয় বিদেশ সফর। পশ্চিমবঙ্গ-ভুটানের শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর ভারত-ভুটান বিজনেস কনক্লেভ-এ বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, শিল্পক্ষেত্রে ভুটানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব স্থাপন করবে পশ্চিমবঙ্গ। পরদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী, ভুটানের রাজা জিগমে কেশর নামগেল ওয়াংচুক, রাজপিতা ৪র্থ ড্রুক এবং রাজমাতার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

জার্মান সফর (৫-১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬)

দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এটি মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম বিদেশ সফর। জার্মানির দুই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সংস্থা বি এম ডবলিউ এবং অ্যাসোসিয়েশন অব জার্মানি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-র আহ্বানে তাঁর এই জার্মান সফর। জার্মান শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকে বারবার মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দেন—বদলে যাওয়া 'বিশ্ববাংলা'-র কথাই মিউনিখ শিল্প সম্মেলনে তুলে ধরতে হবে।

শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বেঙ্গল ইন ডয়েৎসল্যান্ড'। উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার পশ্চিমবঙ্গ। এখান থেকে খুব কম সময়ে তাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ায় পৌঁছে যাওয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রী এদিনের বক্তব্যে মাঝে মাঝে জার্মান শব্দ ব্যবহার করে সকল

শিল্পপতির মন জয় করে নেন। উল্লেখযোগ্য শিল্পপতিদের মধ্যে ছিলেন বি এম ডবলু-র প্রেসিডেন্ট মারিও ও' হিডেন, সিমেন্সের সি এফ ও মার্কাস ফ্রাঙ্ক, হাঙ্গার ইন্টারন্যাশনাল-এর চেয়ারপার্সন ইনগ্রিড হাঙ্গার প্রমুখ।

৫টি স্লোগানে মুখ্যমন্ত্রী 'বিশ্ববাংলা'-কে জার্মানির কাছে তুলে ধরেন। (১) উন্নতি—কন্যাশ্রী, সবুজসাথী, যুবশ্রী (২) উৎসব—দুর্গাপুজো (৩) সংস্কৃতি—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪) ধর্ম—রামকৃষ্ণ পরমহংস, সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ (৫) ঐক্য ও সংহতি—হিন্দু ও মুসলিম যুবকের আলিঙ্গন। পরদিন তিনি বি এম ডবলু-র কারখানাও পরিদর্শনে যান। মিউনিখ শিল্প সম্মেলন রাজ্যের শিল্পায়নের পক্ষে বার্তা পৌঁছে দিল, সন্দেহ নেই।

বিশ্ববাংলায় বাণিজ্য সম্মেলন

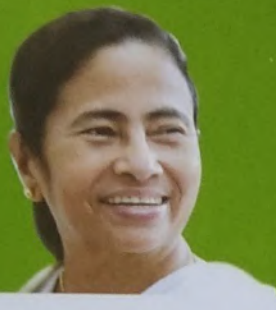

বাংলা মানে ব্যবসা

সার্বিক উন্নয়নের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে পালাবদল। উত্তরণের নবদিশা খুঁজতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রথম দিন থেকেই তৎপর—যার মূল লক্ষ্য উন্নয়ন আর কর্মসংস্থান। লগ্নির আশ্বাস থেকে বাস্তবায়নের পথে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি শুরু করেছেন—বেঙ্গল লিডস থেকে বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলনের সূচনার মধ্য দিয়ে।

শুধুমাত্র স্লোগানে আটকে থাকা রাজ্যের শিল্পায়নের রথের চাকা এই ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ক্ষেত্র পেয়ে তড়তড়িয়ে এগিয়ে চলবে বা চলেছে—সন্দেহ নেই। দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতিরা বিশ্ববাংলার বুকে বাণিজ্য এবং লগ্নি নিয়ে নতুন করে ভাবছেন—মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিপুল অঙ্কের লগ্নির ঘোষণা করছেন—বঙ্গবাণিজ্যের ইতিহাসে এ এক অসীম প্রাপ্তি।

প্রথম শিল্প সম্মেলন বেঙ্গল লিডস—২০১২

৯-১৪ জানুয়ারি, ২০১২। মিলনমেলা প্রাঙ্গণে চলল এই শিল্প সম্মেলন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সরকার প্রথম ৯৯ পৃষ্ঠার আবেদনপত্রকে ৭ পাতায় কমিয়ে এনেছে। ১৫ দিনের মধ্যে সেই শিল্প সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও ছাড়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই শিল্প সম্মেলনে একদিকে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস-এর পুনরুজ্জীবনের আশ্বাস ও শিল্পপতি পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কর্ণধার সত্যম রায়চৌধুরীর জোকায় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে ফুড পার্ক তৈরির কথা ঘোষণা, বাটা কোম্পানির ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব, মারুতি সুজুকির মতো কোম্পানির শিলিগুড়িতে লজিস্টিক হাব তৈরির প্রস্তাব—নতুন রাজ্য সরকারের প্রথম শিল্প সম্মেলন পেল রাজ্যে বিনিয়োগের পরিপূর্ণ আশ্বাস।

দ্বিতীয় শিল্প সম্মেলন বেঙ্গল লিডস—২০১৩

ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ৪৮টি ক্লাস্টার ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ এখন দেশের মধ্যে প্রথম।

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে জমি কোনও সমস্যা নয়। একথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন—সরকার জমি নিতে গেলেই সমস্যা হয়। শিল্পপতিরা সরাসরি ইচ্ছুক জমি-মালিকদের থেকে জমি কিনে নিলে সমস্যা হবে না। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ১৪-ওয়াই ধারায় ঊর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি রাখার অনুমতি দিয়ে দেব। সভামঞ্চ থেকেই এদিন মুখ্যমন্ত্রী ১২টি শিল্প সংস্থাকে কারখানা গড়ার জন্য তাদের চাহিদামতো জমির অর্পণপত্র প্রদান করেন।

পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় হেলিপ্যাড ময়দানে ২০১৩-র ১৫-১৭ জানুয়ারি হয়ে গেল দ্বিতীয় বেঙ্গল লিডস—যার প্রধান বক্তা অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। উদ্‌বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, আমরা ল্যান্ড ব্যাংক-ল্যান্ড ম্যাপ-ল্যান্ড ইউজ পলিসি তৈরি করেছি। নতুন পিপিপি নীতি হয়েছে। অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। রাজ্যে আসুন, বিনিয়োগ করুন। রাজ্যে শিল্পের অগ্রগতির লক্ষ্যে বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। 'সেইল' পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অ্যালয় ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করছে দুর্গাপুরে। রঘুনাথপুরে নতুন শিল্পনগরী তৈরি হচ্ছে।

তৃতীয় শিল্প সম্মেলন বেঙ্গল লিডস—২০১৪

এই শিল্প সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ভিন রাজ্য এবং বিদেশি শিল্পপতিদের এই রাজ্যে নিয়ে আসা। ৯-১০ জানুয়ারি, কলকাতার মিলনমেলা প্রাঙ্গণে এই শিল্প সম্মেলনের সূচনা হয়। উদ্‌বোধন করেছিলেন অর্থমন্ত্রী ড. অমিত মিত্র। শিল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনাকে শিল্প সম্মেলনে তুলে ধরে অর্থমন্ত্রী বলেন, শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করতে চাইলে স্বাগত। রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগমের হাতে এখনও পর্যন্ত ৩২৬৩ একর জমি এবং ২৩টি শিল্প পার্ক রয়েছে। মানবসম্পদের ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। শিল্পের মানোন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার প্রতি ব্লকস্তর পর্যন্ত আইটিআই তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছে। শান্তি ফিরেছে দার্জিলিংয়ে এবং জঙ্গলমহলে।

বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন (১ম সংস্করণ)—২০১৫

বাংলার বাণিজ্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে এই প্রথম রাজ্যের শিল্প সম্মেলনের নাম পরিবর্তন করে হল বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন। কলকাতার মিলনমেলা প্রাঙ্গণে, ৭-৮ জানুয়ারি, শিল্প সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। ব্রিটেন, জাপান, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, চীন, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, স্পেন, বেলারুস, চেক প্রজাতন্ত্র, ভুটান ইত্যাদি প্রায় ২০টি দেশের শিল্প প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এই শিল্প সম্মেলন। ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব আসে এই সম্মেলন থেকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সেইল-এর প্রসারণ প্রকল্পে ৪০ হাজার কোটি, ২২টি টাউনশিপে আর্থিক উন্নয়ন কেন্দ্র তৈরির জন্য ৬৭ হাজার ৭০৮ কোটি, এসেল গ্রুপের ১০ হাজার কোটি, এন টি পি সি-র ২০ হাজার কোটি, ক্ষুদ্র শিল্পে ১৭ হাজার ৬৫৭ কোটি, ভোরসাগর গভীর সমুদ্র বন্দর ও হলদিয়ার প্রসারণে ১৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব।

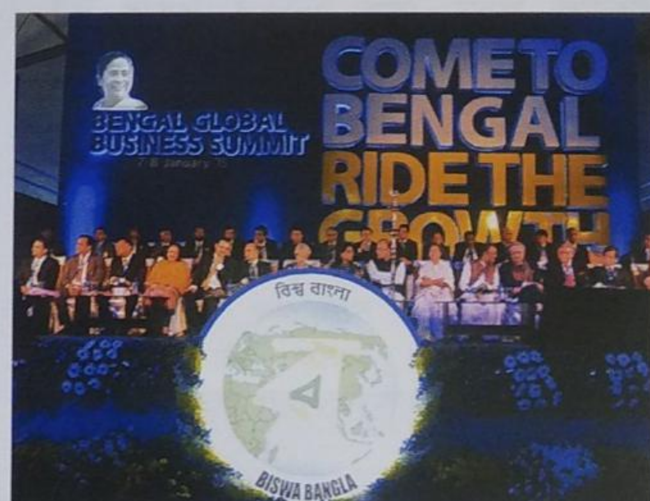

বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন (২য় সংস্করণ)—২০১৬

লগ্নির ক্ষেত্র এবার পশ্চিমবঙ্গ। এই ভাবনাকে সামনে রেখে ২০১৬-র বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন হয়ে রইল পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে অন্যতম এক মাইলফলক। এই সম্মেলনে বিনিয়োগের প্রস্তাবনা আসে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ২৫৩ কোটি টাকার। উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের মধ্যে এবারের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে, বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী তাফায়েল আহমেদ, ব্রিটেনের কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রী প্রীতি প্যাটেল, দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলি ও নীতিন গডকারি, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রমুখ। এই প্রথম জাপান সহযোগী দেশ হিসেবে অংশগ্রহণ করল। এছাড়াও মোট ২৬টি দেশ শিল্প সম্মেলনে তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল।

বিনিয়োগের প্রস্তাবনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল—পরিকাঠামো ও ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ১০৭ কোটি লগ্নির প্রস্তাব। টিসিজি গ্রুপ ২০ হাজার কোটি, জিন্দাল গ্রুপ ১০ হাজার ৫০০ কোটি, শিল্পোন্নয়ন নিগমের বিভিন্ন শিল্প পার্ক তৈরিতে ২০ হাজার কোটি, এসেল গ্রুপের ৪ হাজার কোটি, পরিকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর মোট ৩৭ হাজার ৪৮২ কোটি, খনি অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পের জন্য ২৩ হাজার ৩০০ কোটি, প্রাণীসম্পদ ও মৎস্যশিল্পের জন্য ৪৫ কোটি ও ১১৫ কোটি, পরিবহণ শিল্পে ৯ হাজার ৩৮৪ কোটি, নগরোন্নয়নের জন্য ২৮ হাজার কোটি ইত্যাদি।

বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন (৩য় সংস্করণ)—২০১৭

স্থায়ী এবং স্থিতিশীল সরকার, উন্নততর পরিকাঠামো, সামাজিক সুরক্ষায় জোর, উন্নততর ই-গভর্ন্যান্স, নজরকাড়া আর্থিক উন্নতি—পশ্চিমবঙ্গে এখন দেশের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য রাজ্য হিসেবে বিনিয়োগের সভামঞ্চ তৈরি। এখানে এখন লগ্নি এবং বাণিজ্য করা অনেক সরলীকৃত হয়েছে। দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশিদের লগ্নির কেন্দ্র এখন বিশ্ববাংলা। রয়েছে কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে আসুন, লগ্নি করুন—তৃতীয় বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলনের উদ্‌বোধনী ভাষণে এভাবেই বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। ২ দিনের এই শিল্প সম্মেলনে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৯০ কোটি বিনিয়োগের প্রস্তাব আসে রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে। ২৯টি দেশ-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় ৪ হাজার প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নেন।

এই শিল্প সম্মেলনের সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল—ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী এই সম্মেলনের সূচনা করেন। এই সম্মেলনে মোট ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৯০ কোটি টাকার শিল্প বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—উৎপাদন ও পরিকাঠামো শিল্পে ৬১ হাজার ৭৬৫ কোটি, পরিবহণ শিল্পে ৩৮ হাজার ৮০১ কোটি, ক্ষুদ্র-ছোট-মাঝারি শিল্পে ৫০ হাজার কোটি, তথ্য প্রযুক্তি ও টেলিকম শিল্পে ১৮ হাজার ৫৪০ কোটি, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় ২ হাজার ১৮ কোটি, বিদ্যুৎ ও অপ্রচলিত শক্তি উৎস সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের শিল্পের ক্ষেত্রে ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে।

বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন (৪র্থ সংস্করণ)—২০১৮

বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের চতুর্থ সংস্করণ হয়ে গেল কলকাতার নিউটাউনে, বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে। আন্তর্জাতিক মানের এই কনভেনশন সেন্টারে আগত শিল্পপতিদের মধ্যে ছিলেন মুকেশ অম্বানি, লক্ষ্মীনিবাস মিত্তাল, সজ্জন জিন্দাল, প্রণব আদানি, নিরঞ্জন হিরানন্দানি, অজয় সিং, উদয় কোটাক, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা প্রমুখ। ৩২টি দেশ-সহ ৯টি সহযোগী দেশের উজ্জ্বল উপস্থিতি এই সম্মেলনকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন, 'টপ অব দ্য টপ'।

সম্মেলনের প্রথম দিন যখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এসো এসো আমার ঘরে এসো', তখন প্রত্যেকেরই অভিভূত হওয়ার পালা। শিল্পপতিদের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, কেউ লগ্নি করতে চাইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভীষণ আন্তরিক। এই রাজ্যকে নিজের বাড়ি ভাবুন। আর দ্বিতীয় দিন প্লেনারি সেশনে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্যের প্রাপ্তি ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৯২৫ কোটি বিনিয়োগের আশ্বাস। এই বিনিয়োগের পাশাপাশি ২০ লক্ষ কর্মসংস্থানের পথও খুলবে। বিগত সম্মেলনগুলিতে যে লগ্নি এসেছে, তার ৫০ শতাংশের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

শিল্পের জন্য জমি প্রাপ্তি যে রাতারাতি সম্ভব হয়নি, সেকথাও বোঝাতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পূর্বতন সরকারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সহিষ্ণুতা দিয়ে তিনি এ রাজ্যে শিল্পের বাতাবরণ তৈরি করেছেন। সংস্কৃতিতে বাংলা এক নম্বর, সাংস্কৃতিক রাজধানী। আন্তর্জাতিক লগ্নির কেন্দ্র হিসেবে বাংলা ইতিমধ্যেই মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। এখানে অতিরিক্ত ল্যান্ড ব্যাঙ্কের পাশাপাশি রয়েছে আলাদা জমি নীতি। সাড়ে আট কোটি মানুষকে দুটাকা কিলো চাল দেওয়া কিংবা একের পর এক সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে বিনা পয়সায় প্রান্তিক মানুষকে চিকিৎসা প্রদান—সবটাই এখন ঘটছে পশ্চিমবঙ্গে।

সম্মেলনের প্রথম দিন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের কৃষির জন্যও শিল্পপতিদের কাছে লগ্নির আহ্বান জানান। এটা সমাজের বড় সম্পদ। কৃষি ও শিল্প এ রাজ্যে ভাই-বোনের মতো। সুতরাং কৃষি ও শিল্প খুশি হলে বাংলাও খুশি থাকবে।

অর্থমন্ত্রী ড. অমিত মিত্র জানান, লগ্নির অঙ্কের সিংহভাগটাই এসেছে উৎপাদন ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে, যেখানে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। এই সম্মেলনের সবচেয়ে মূল লক্ষ্য হল— কর্মসংস্থান, কর্মসংস্থান এবং কর্মসংস্থান। মুখ্যমন্ত্রী বারবার সেটাই চেয়েছেন, সেটাই হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে জানান, এই বাংলা শ্রমবান্ধব—পরিবেশ বান্ধব। এখানে শ্রমদিবস নষ্ট হয় না। ফলে একদিকে শিল্পপতিরা যেমন এগিয়ে আসছেন; অন্যদিকে এডিনবরা-এক্সিটার বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান এখন বাংলার শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গেই হবে 'ইন্ডাস্ট্রি হাব', 'এডুকেশন হাব'।

পাহাড়ে আজ শান্তির আবহ

(লক্ষ্য : উন্নয়ন আর কর্মসংস্থান)

নতুন রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরেই যে সকল সমস্যায় সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে, তার একটি উত্তরবঙ্গ তথা দার্জিলিং-এর সমস্যা মেটানো—পাহাড়ের মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা। প্রয়োজনে রাজ্যের মধ্যে থেকেই একটু বেশি স্বশাসন— নিজস্ব চাহিদা বুঝে উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পাহাড়ের মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল পাহাড়ে শান্তি স্থাপন, যেটা নতুন রাজ্য সরকার করে দেখিয়েছে।

নতুন রাজ্য সরকার কার্যভার গ্রহণের দু'মাসের মধ্যেই এই সমস্যাগুলি মিটিয়ে ওই এলাকায় শান্তিস্থাপনের সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে। ঐকমত্যের মাধ্যমে বকেয়া ইস্যুগুলি মেটানোর পাশাপাশি পাহাড়ে প্রশাসনিক, আর্থিক, কার্যকরী ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্বশাসিত সংস্থা গঠনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জনজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়।

ত্রিপাক্ষিক চুক্তি এবং জিটিএ গঠন

১৮ জুলাই, ২০১১। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং জি জে এস (গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা)-র মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষে সই করেন দপ্তরের যুগ্ম সচিব কে কে পাঠক। অন্যদিকে রাজ্য সরকারের পক্ষে ছিলেন স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ডঃ জি ডি গৌতম এবং জি জে এম-এর পক্ষে ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি। মোট ৩২টি বিষয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পরবর্তীকালে ২০১১-র ২ সেপ্টেম্বর জিটিএ বিলটি রাজ্য বিধানসভায় পাশ করা হয় এবং চুক্তি কার্যকর করার লক্ষ্যে বিলটি কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা দেবী সিং পাতিল ২০১২-র ৭ মার্চ জিটিএ বিলে সই করলে রাজ্য সরকার প্রথম জিটিএ নির্বাচনের জন্য সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী হয়। ইতিমধ্যে তরাই ও ডুয়ার্সের কিছু মৌজার অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামল সেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি হয়। ২০১২-র ২৯ জুলাই জিটিএ-র ৪৫টি আসনে ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়ে তৈরি হল প্রথম নির্বাচিত গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

বারবার শান্তি ও উন্নয়নের বার্তা

একসময়ের অশান্ত পাহাড়ে শান্তি ফিরিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যেমন ১৩ মার্চ ২০১৩। নতুন রাজ্য সরকারের ২২ মাসে ১৯তম সফর মুখ্যমন্ত্রীর। পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্সের হাজার হাজার মানুষ সমস্ত ভয় অগ্রাহ্য করে ভরিয়ে তুলেছেন তাঁর জনসভা। সেখানে প্রত্যয়ী মুখ্যমন্ত্রীর দৃপ্ত ঘোষণা, শান্তি ও উন্নয়নের প্রশ্নে সকলকেই এক হতে হবে। পাহাড় শান্তিতে আছে, ভাল থাক। উন্নয়ন হোক। সমতলও ভালো থাকুক।

এভাবে মুখ্যমন্ত্রী যতবার পাহাড় সফরে গিয়েছেন, প্রতিবার শান্তিবিরোধী কাজকর্ম কিংবা বন্‌ধ ছেড়ে বেরিয়ে আসার বার্তা দিয়ে এসেছেন। ২০১৩-র সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। কালিম্পং-এর মাঠে লেপচা উন্নয়ন পর্ষদের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে লেপচারা মুখ্যমন্ত্রীকে 'কিংচুম ডারমিট' বা 'সমৃদ্ধির দেবী' হিসেবে সম্মানিত করলেন। এই সময় নানা কারণে পাহাড়ে চলছিল বন্‌ধ। চলছিল আন্দোলন। কিন্তু সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বন্‌ধ ভেঙে বেরিয়ে আসার অহ্বানে মানুষ যেন বুকে বল পেল। ক্রমশ শান্তির পথে পাহাড়। মুখ্যমন্ত্রী এই সফরে কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং আসার পথে 'ঘুম' পেরিয়ে একটি বৌদ্ধ মঠে যান এবং পাহাড়ের শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন। গৃহ নির্মাণের জন্য লেপচা মহিলাদের হাতে চেকও তুলে দেন তিনি।

প্রায় প্রতি বছরই দার্জিলিং-এর ম্যালে নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে একদিকে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখা—অন্যদিকে এই উন্নয়ন দিয়েই পাহাড়বাসীকে বাকি রাজ্যের সঙ্গে বেঁধে রাখা, এই উদ্দেশ্য নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর বারবার পাহাড় সফর।

পাহাড়ে বন্যাবিধ্বস্তদের পাশে

১ জুলাই ২০১৫। প্রবল বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস নেমে ব্যাপক ক্ষতি হল দার্জিলিং জেলার জনজীবন। বীরভূমের পূর্বনির্ধারিত প্রশাসনিক বৈঠক বাতিল করে মুখ্যমন্ত্রী ছুটেছেন দার্জিলিংয়ে। অবশ্য তাঁর নির্দেশে স্বরাষ্ট্রসচিব আগেই পৌঁছেছেন সেখানে। প্রবল ধসে মৃতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা এবং দুর্যোগে আহতদের ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর জিটিএ-কে নির্দেশ দিলেন, পাহাড়ের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সারিয়ে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

নতুন জেলা, মহকুমা

১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ কালিম্পংএর মেলা গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী কালিম্পংকে নতুন জেলা হিসাবে ঘোষণা করলেন। কালিম্পং-এ সেদিন উৎসবের আবহ। হাজার হাজার মানুষ পথে নেমে স্বাগত জানাল মুখ্যমন্ত্রীকে। আর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভ্যালেনটাইনস ডে এখন থেকে কালিম্পং ডে। আমরা পর্যটন বিকাশের জন্য অনেক কাজ করেছি। হিল টপ টুরিজম সার্কিট হয়েছে। কালিম্পংএর মানুষকে এখন থেকে আর দার্জিলিং যেতে হবে না। রাজ্য সরকার কালিম্পং-সিকিম সিল্ক রুটের মানোন্নয়ন ঘটাবে। আমরা বিশ্বাস করি, একতাই বল। সরকার কোনওরকম অশান্তি বরদাস্ত করবে না।

এরপর মিরিককে দার্জিলিং জেলার নতুন মহকুমা হিসাবে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিনটা ২০১৭-র ৩০ মার্চ। এর আগে মিরিক ছিল দার্জিলিংয়ের শুধু একটি ব্লক। দিনটি ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা, পাহাড়ে পর্যটনে জোর দেওয়া হয়েছে। টাইগার হিলে নতুন প্রকল্প শুরু হয়েছে। ফিরছে শান্তি।

উন্নয়ন আর শিল্পায়নের বার্তা নিয়ে বারবার পাহাড় সফরে মুখ্যমন্ত্রী

উন্নয়ন।

শান্তি।

শিল্পায়ন আর কর্মসংস্থান।

পরপর এই চারটি শব্দবন্ধে পাহাড় তথা দার্জিলিং-এর আগামীদিনের গতিপ্রবাহকে বেঁধে দিয়ে গেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। বারবার এসেছেন পাহাড়ে। পেয়েছেন উষ্ণ অভ্যর্থনা। বারবার বলে গেছেন, প্রশাসনের কাছে পাহাড়ের সার্বিক উন্নয়নই শেষ কথা। সুতরাং এখানে উন্নয়নের স্বার্থে পাহাড়ের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আমরা পাহাড়ের হাসিমুখ দেখতে চাই। শিল্পে দক্ষতা বাড়লে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তায় এটা স্পষ্ট, আগামীদিনে উত্তরবঙ্গ তথা পাহাড়ে শিল্পায়ন আর কর্মসংস্থানের জোয়ার আনতে সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

উত্তরবঙ্গ ছাত্র-যুব কর্মশালায় যোগ দিতে এদিন শিলিগুড়ি পৌঁছন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। এদিনই কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি।

৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

উন্নয়নের বার্তা নিয়ে ফের পাহাড় সফরে মুখ্যমন্ত্রী। সুকনা বনবাংলো থেকে দুপুরের দিকে তিনি বেরিয়ে পড়েন রোহিণীর দিকে। রোহিনী মোড় থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে পাঙ্খাবাড়ি মিরিকের দিকে। অন্যদিকের পথ কার্সিয়াং-এর দিকে। কাঁচা-ভাঙাচোরা যে রাস্তার নাম ছিল রোহিণী রোড তাকেই ঝাঁ,চকচকে করে নব কলেবরে নতুন নামকরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী, 'সুবাস ঘিসিং মার্গ'।

পথে অপেক্ষা করছিলেন বহু মানুষ। শুধু সমতলবাসী নয়, পাহাড়ের মানুষও দু-হাত বাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। রাস্তার নামফলক উন্মোচনের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, পাহাড়ের উন্নয়ন আমাদের লক্ষ্য। সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে কাজ করা হবে। পাহাড়ি গোর্খা-আদিবাসী-সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু সকলের জন্যই পাহাড়ের উন্নয়ন ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

কনকনে ঠাণ্ডা। ঘন কুয়াশায় ছেয়ে পাহাড়। এরই মধ্যে কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিং-এর ভানুভবন অডিটোরিয়াম পর্যন্ত কাতারে কাতারে মানুষের ভিড়। মুখ্যমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল পাহাড়বাসী। বেজে উঠল নেপালি বাদ্য। অনেকের হাতে লেখা প্ল্যাকার্ড—থ্যাঙ্ক ইউ। গোর্খা রঙ্গমঞ্চের কাছে গাড়ি থেকে নেমে ভানু ভবন পর্যন্ত হেঁটেই পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। জিটিএ-র পক্ষ থেকে খাদা (উত্তরীয়) পরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

ভিড়ে থইথই দার্জিলিং-এর ম্যাল। উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সহায়তায় শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট-সহ দার্জিলিং জেলা পুলিশ আয়োজিত 'হিমল-তরাই-ডুয়ার্স ক্রীড়া উৎসব- ২০১৮' এর অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও রাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, জিটিএ অথরিটির চেয়ারম্যান বিনয় তামাং, মুখ্যসচিব মলয় কুমার দে, মহানির্দেশক সুরজিৎ কর পুরকায়েস্থ প্রমুখ। এদিন, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট আওতাধীন এলাকা-সহ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কালিম্পং জেলার মোট ৮০৫টি ক্লাব এবং ১৮,৫০০ জন যুবক-যুবতী মার্শাল আর্ট, তিরন্দাজি, ফুটবল ও ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অনীত থাপা, মন ঘিসিং, পাহাড় উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য অজয় এডওয়ার্ড, দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারপার্সন প্রতিভা রাই, পাহাড়ের তিন বিধায়ক প্রমুখ।

সারি সারি পাইন গাছ। সকাল থেকে ঘন কুয়াশা আর ঠান্ডায় মোড়া পাহাড়ের জনজীবন। দুপুরে ঐতিহ্যবাহী ম্যাল-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে নেপালিতেই বলেন, পাহাড়কো উন্নতি

চাইনছি। বিকাশ, শান্তি চাইনছু...। শুনে হাজার হাজার পাহাড়বাসীর উচ্ছ্বসিত করতালি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পাহাড় উন্নতি চাইছে। শান্তি চাইছে। সিকিম ভালো থাকুক, পর্যটন আসুক, এটা সবাই চায়। ব্যবসারও উন্নতি হোক। ফলে পাহাড়-দার্জিলিং যদি বন্ধ থাকে, তবে কোনও উন্নতি হবে না। দার্জিলিং বাংলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর পাহাড়ের সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী আসে সমতল থেকে। ফলে একসঙ্গে থেকেই উন্নয়ন করতে হবে। এখানে শিল্পতালুক ও বিশ্ববিদ্যালয় হবে। দার্জিলিং সিকিমের থেকেও সবুজ আর সুইজারল্যান্ড থেকেও সুন্দর। একে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন খেলায় জয়ী সেরাদের হাতে ১লক্ষ টাকার চেক, টু হুইলার, সিভিক ভলেন্টিয়ারের হাতে নিয়োগপত্র এবং পাহাড়ে নানা অশান্তিকামীদের ঘটনায় মৃতদের পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য তুলে দেন।

৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

এদিন রাজভবনে টানা ১ঘন্টার বেশি, দার্জিলিং-এর মানুষের উন্নতির বিষয় নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। ছিলেন মোর্চা সভাপতি বিনয় তামাং, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, লেপচা-তামাং-ভুজেল-সহ ১৩টি পর্ষদের চেয়ারম্যান, রাজ্যের দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ইন্দ্রনীল সেন, মুখ্যসচিব মলয়কুমার দে প্রমুখ।

বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সদর্থক বৈঠক হয়েছে। হিংসা ও অশান্তিকে দূরে সরিয়ে রেখে পাহাড়ের উন্নয়নে সকলেই কাজ করতে সম্মত হয়েছেন। এখন শুধুই সামনে এগোনো। মতাদর্শগত পার্থক্য যেন পাহাড়ের উন্নয়নে অন্তরায় না হয়, সেটাই দেখতে হবে।

তিনি জানান মে মাসের শেষে কালিম্পংএ হবে উন্নয়ন কনভেনশন। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি খোঁজা চলছে।

শান্তি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যেই আগামী দিনেই এগোবে উত্তরবঙ্গ-পাহাড়-দার্জিলিং। পাহাড় সফরশেষে এই বার্তাই দিয়ে, ৯ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায়, কলকাতা ফিরে এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

ব্যানার্জী।

পাহাড়ে প্রথম শিল্প সম্মেলন

১৩ মার্চ, ২০১৮

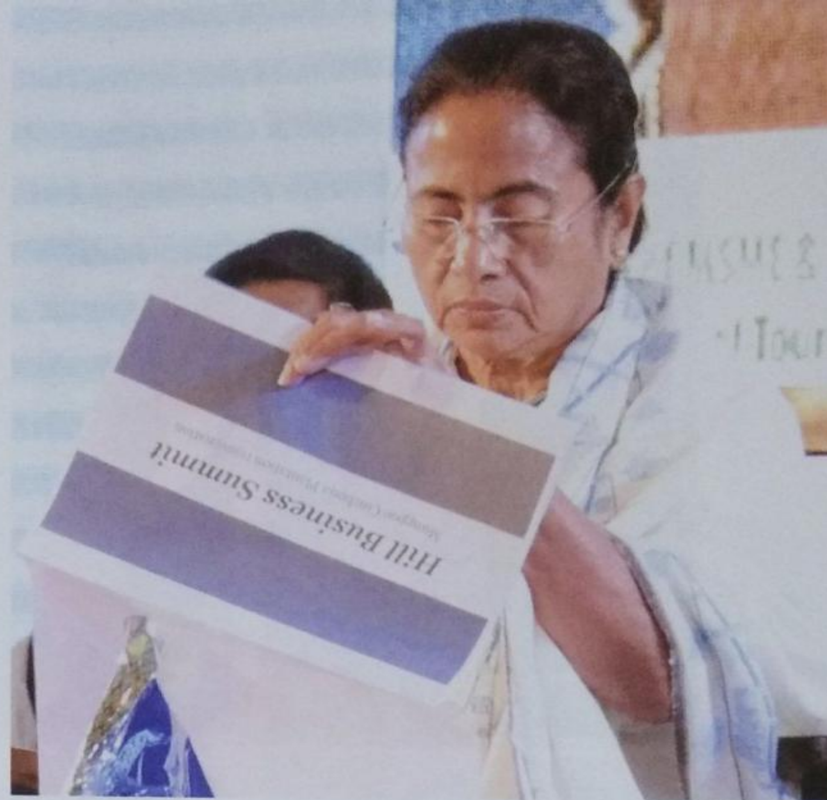

উন্নয়ন, সমৃদ্ধি আর শিল্পায়নের বার্তা নিয়ে আরও একবার ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইল দার্জিলিং-এর ম্যাল। পর্যটকদের কাছে ম্যাল হল দার্জিলিং-এর অন্যতম গন্তব্য আর পাহাড়বাসীর কাছে অন্যতম স্মরণীয়, কারণ এখানেই বহু সভায় মুখ্যমন্ত্রী এর আগে উন্নয়নের কথা জানিয়ে গিয়েছেন। এবারও রইল। কারণ এই পাহাড়ের শুরু হল ২ দিনের 'হিল বিজনেস সামিট'।

শিল্প পরিবেশ গড়ে তুলতে পাহাড়ের জন্য প্রথম পর্যায়ে ১০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, এখানে বহু কর্মহীন যুবক-যুবতী রয়েছেন। তাঁদের কাজ চাই। যেসব শিল্পের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে, সেসব শিল্পই শুধু এখানে করতে হবে। উল্লেখ্য, এই শিল্প সম্মেলনে রাজ্য সরকারকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছে বণিকসভা সি আই আই। সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল চন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, এখানে সি আই আই স্কিল ডেভলপমেন্ট সেন্টার গড়ে তুলতে পারে। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে স্টার্ট আপ বিজনেস সেন্টার তৈরিতেও তাঁরা সাহায্য করবেন। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের পাশাপাশি পাহাড়ের ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের সমস্যা মেটাতেও উদ্যোগ নেবে বণিকসভা। কেভেন্টার্স গোষ্ঠীর মায়াঙ্ক জালান বলেন, পাহাড়ে ২৪ মাসের মধ্যে বড় ধরনের বিনিয়োগ করব।

সকাল থেকেই হালকা রোদের ঝিলিক। বাইরে কৌতূহলী জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ছেন। যখন মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পপতিরা একের পর এক শিল্প সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করছেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বারবার পাহাড়ে শান্তির বার্তা দিয়ে বলেন, রাজ্যসরকার ও শিল্পপতিরা প্রস্তুত। হর্টিকালচার, তথ্য-প্রযুক্তি এবং অর্কিড শিল্পে এখানে প্রচুর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। সেজন্য শান্তি না থাকলে শিল্পায়ন আর উন্নয়ন কীভাবে হবে! জাপান এখানে বিনিয়োগ করতে চায়। পাহাড়ে ভেষজ শিল্প হতে পারে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য বিশেষ অঞ্চল তৈরি করে সাফল্য আসবে। কার্শিয়াঙে মেডিক্যাল কলেজ হবে। অনেক কটেজ তৈরি করেও পর্যটন শিল্পের উন্নতি সম্ভব।

১৪ মার্চ, ২০১৮

প্রথম শিল্প সম্মেলন। আর তাতেই পাহাড়ের প্রাপ্তি ২০০০ কোটি। তবে এদিনও মুখ্যমন্ত্রী বারবার স্মরণ করিয়ে দেন পাহাড়ে শান্তি বজায় থাকলে দ্রুত উন্নয়ন-শিল্পায়ন-কর্মসংস্থান সম্ভব। এখানে বিনিয়োগের সম্ভাব্য হল—পর্যটন, হোম ট্যুরিজম, টি ট্যুরিজম, ফুল চাষ, কমলালেবু চাষ, স্কিল ডেভলপমেন্ট, কফি চাষ, ওষধি গুল্মের চাষ, কৃষিভিত্তিক শিল্প, অর্কিড চাষ, হোটেল ব্যবসা, স্ট্রবেরি, পোলট্রি, গোপালন, সিঙ্কোনা, বড়ো এলাচ এবং আদার চাষ। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, চা-শিল্পে বাঙালি শিল্পপতি হিসেবে রুদ্র চট্টোপাধ্যায়রা মাটিগাড়া এবং মকাইবাড়ি এলাকায় প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। আপনারা শুধু দার্জিলিংকে এগিয়ে নিয়ে যান। সরকারের তরফে যা যা করার, আমরা সবরকম সাহায্য করব। আমরা চাই শুধু শান্তি। বাংলা চায় পাহাড় হাসুক। আজ বাংলা মানে ব্যবসা। বেঙ্গল মিন্‌স বিজনেস। আজ বড়ো বড়ো শিল্পপতিদের প্রত্যেকের গন্তব্যস্থল বাংলা। দার্জিলিং-এর বিভিন্ন ব্লক চিহ্নিত করে, স্থানীয় যুবক-যুবতীদের ট্রেনিং দিয়ে, শিল্প স্থাপনে আগ্রহী শিল্পপতিরা। শান্তি আসুক, শিল্প আসুক, এটাই চাই।

ছন্দে ফিরেছে পাহাড়

রাজ্য সরকারের দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টার ফলে দার্জিলিং জেলা এবং ডুয়ার্সের পরিস্থিতি স্বাভাবিক। উন্নয়নমুখী নানা প্রকল্পের ফলে পার্বত্য অঞ্চলে মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি আগের থেকে অনেক ভালো হয়ে উঠেছে। আদিবাসী উন্নয়ন এবং অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের অধীনে পাহাড়ের জনজাতি-আদিবাসী-অনগ্রসর মানুষের জন্য তৈরি হয়েছে ১৬টি পৃথক বোর্ড বা পর্ষদ।

আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের অধীন ৬টি পর্ষদ হল—পশ্চিমবঙ্গ মায়েল লিয়াং লেপচা উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ তামাং উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ শেরপা সাংস্কৃতিক পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ ভুটিয়া উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ লিম্বো উন্নয়ন পর্ষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষদ। এছাড়া অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ১০ টি পর্ষদ হল পশ্চিমবঙ্গ মঙ্গার উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সম্বু রাই উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ ভুজেল উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ দামাই উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ কামী উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকি উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ নেওয়ার উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ গুরুং উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ কুর্মী উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষদ এবং গোর্খা সম্প্রদায়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ তরাই-ডুয়ার্স-শিলিগুড়ি উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ।

ধাপে ধাপে উন্নয়নের পথে

জঙ্গলমহল

এসেছিল মুক্তি। মুক্তির আনন্দের বিহ্বলতা কাটতে না কাটতেই এল ক্ষুন্নিবৃত্তির ঢালাও ব্যবস্থা। মাঠে মাঠে শুরু হল চাষ-আবাদ। বছরভর জলের সমাধানে জল ধরো জল ভরো-র কাজ। জল যে কত বড়ো সম্পদ সে তো জানে গ্রামের মানুষ। বিশেষ করে, পশ্চিমাঞ্চলের পাথুরে মাটির মানুষেরা। ১০০ দিনের কাজে জঙ্গলমহল গড়ে উঠতে লাগল পঞ্চায়েতসহ অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় তৈরি করে।

পথ-ঘাট, সড়ক, সেতু তৈরি হতে লাগল। সারানো হল। পথে পথে আলো। ঘরে ঘরে আলো। পানীয় জলের ব্যবস্থা হল দূর প্রান্তের গ্রামে গ্রামে। বাড়িতে বাড়িতে জল পৌঁছে গেল পাইপে করে।

জঙ্গলমহলের মানুষ এই প্রথম বুঝতে পারল যে সরকার ইচ্ছে করলে আমাদের ভালো রাখতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা করে দেখালেন।

বারে বারে তিনি ছুটে গিয়েছেন জঙ্গলমহলের মানুষের কাছে। শুনেছেন তাঁদের সমস্যার কথা। আর ভেবেছেন—পৃথিবীর প্রাচীনতম মানবসভ্যতা শুরু হয়েছিল যেখানে সেখানের মানুষদের জন্য কেমন উন্নয়ন প্রয়োজন।

গ্রামের শিশুদের জন্য ভাবলেন শিশুআলয়ের কথা। দূর দূর গ্রাম থেকে ওরা স্কুলে, কলেজে যাবে তাই ভাবলেন সবুজসাথীর কথা। ওরা সাইকেল ছুটিয়ে পড়তে চলেছে। এইভাবে তিনি ওদের আলোর পথের যাত্রী করে তুললেন। বই, খাতা, ব্যাগ, পোশাক, সাইকেল, মিড-ডে-মিল, নানা বৃত্তি, কন্যাশ্রী—ওদের জীবনের অন্ধকার শৈশব-কৈশোরকে মাতিয়ে তুলল।

ক্লাবে ক্লাবে খেলার পরিবেশ, দামাল-দস্যিপনায় ওরা দাপিয়ে বেড়ায়। পায়ে পায়ে দিদির দেওয়া ফুটবল।

গ্রামে গ্রামে মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করেছে। স্বাস্থ্যসাথী, সমাজসাথীর সুবিধা পাচ্ছে, পাচ্ছে স্বনির্ভর হওয়ার অর্থ, প্রশিক্ষণ। গ্রামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাল্টে গিয়েছে জঙ্গলমহলে।

জঙ্গলমহলের ইতিহাস, ভূগোল, জনজাতির বৈশিষ্ট্য এগুলি বিশদভাবে না জানলে জঙ্গলমহলের উন্নয়নকে বোঝা যাবে না। বর্তমান সরকার তাই সর্বদা এইগুলিকে বিশেষভাবে মূল্য দিতে উদ্‌গ্রীব।

হাজার হাজার বছরের যে মানবসভ্যতা আজও নিজস্বতায় ভরপুর তাকে এক লহমায় উন্নয়নের উড়ানে চরিয়ে দেওয়া যায় না । ধাপে ধাপে এখানে স্থায়ী উন্নয়ন করতে হবে যা করে চলেছে সরকার তার নানা কল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে।

লোকপ্রসার প্রকল্প জঙ্গলমহলের আত্মাকে যেন প্রাণিত করেছে। লোকসংস্কৃতির নানা ডালপালায় ফুল ফুটিয়ে চলেছে এই প্রকল্প। নানা জনজাতির সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ জঙ্গলমহলে এই প্রকল্প আর্থিক সমৃদ্ধিকেও সম্ভব করে তুলেছে। তাঁদের জীবনে নাচ-গান আর বাদ্যযন্ত্র বড়ো ভূমিকা নেয়। সহজ, সরল এই মানুষেরা প্রকৃতির খোলা হাওয়ায় নিজেদের মেলে ধরতে চায়।

আজ যখন সকলের জীবনযাপনেই রঙ লেগেছে আধুনিকতার, তাঁরাও কিন্তু পিছিয়ে থাকতে রাজি নন।

তাঁদের হাতেও স্মার্ট ফোন, তাঁদের শিশুরাও কথা বলতে চায় ইংরেজিতে। ওঁরাও ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক হতে চান। এই নতুন প্রজন্মকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে বর্তমান সরকার। দিগন্ত-জোড়া মডেল স্কুল হয়েছে ওদের জন্য। মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতালে জন্ম হচ্ছে ওদের। আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে গিয়েছে ওঁদের দোরে।

আগামীর ভবিষ্যৎ ওরা। ওদের জন্য সুসজ্জিত অঙ্গনওয়াড়ি, প্রশিক্ষিত আশাকর্মী।

পরিবারের আর্থিক বিকাশেও সরকার সদা উদগ্রীব। উদ্যমী। স্কুল-ছুট ছেলে মেয়ে, নারী-পুরুষের জন্য 'উৎকর্ষ' বাংলা কর্মসূচির মাধ্যমে চলছে নানারকম হাতের কাজের প্রশিক্ষণ। সারা রাজ্যের সঙ্গে কারিগরী শিক্ষা দপ্তর বিশেষ জোর দিয়েছে 'জঙ্গলমহল'-এ। যে শ্রমশক্তি এতদিন প্রশিক্ষিত হওয়ার তেমন সুযোগ পায়নি, তাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়নের কাজে লাগাতে সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। জ্যাপ-এর মাধ্যমে এই প্রয়াস কিছুটা নেওয়া হয়েছে আগেই যদিও।

নানা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জঙ্গলমহলের মানুষকে উন্নয়নের মূল স্রোতে আসতে হবে। এটা ওখানের মানুষ বুঝেছেন গত সাত বছরে।

তাই দেখি জঙ্গলমহল-সহ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার নানা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এছাড়াও নানা সংগঠনের সহযোগিতা ও পরিচালনায় হাতে-কলমে নানা কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা চলেছে। ওইসব অঞ্চলের বংশপরম্পরায় অর্জিত সুদীর্ঘ সময়ের পেশাগত অভিজ্ঞতাকেও নানাভাবে পরিশীলিত ও আধুনিক যুগের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা চলছে। চাষবাস ও উদ্যানপালনেও এই অঞ্চলকে পরীক্ষামূলকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এই অঞ্চলের মানুষ পরিশ্রমী। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই আজ 'মানবিক ঐতিহ্য'-র গৌরবগাথা হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি-মুখী জীবনযাপনের চির-অভ্যস্ততায় তাঁরা উন্নয়নের স্বপ্ন দেখে। তাই তাঁদের উন্নয়নের কথা তাঁদের ভাবনায় যেভাবে ধরা দেয়, সরকার তাই রূপায়ণের কথা ভাববে। গত সাতবছরে মা-মাটি-মানুষের সরকার এই কাজটাই করে চলেছে।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মতো রুখা-সুখা জেলার জঙ্গলমহল এলাকায় স্বনির্ভর দল তৈরি করে চলছে বেদানা, মুসম্বির মতো বাগিচা ফসলের চাষের উদ্যোগ। আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের নানা গবেষণার মাধ্যমে এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে জঙ্গলমহলের প্রান্তিক গ্রামের মানুষেরা। এখন তাঁরা অন্য জেলায় কৃষি-শ্রমিক হয়ে আর যান না। নিজের গ্রামেই তাঁরা রোজগারের পথ খুঁজে পেয়েছেন। পঞ্চায়েত দপ্তরের সঙ্গে বিভিন্ন দপ্তর মিলেমিশে এইরকম গ্রাম গড়ে তুলছে।

জেলার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তরেও প্রতিনিয়ত চলছে এই অঞ্চলের উন্নয়নের নানা ভাবনার ছক। জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও এবং বিভিন্ন দপ্তরের জেলা, মহকুমা, ব্লকের আধিকারিকরা পঞ্চায়েতের আধিকারিক ও সদস্যরা সকলেই এই উদ্যোগে সামিল।

এই অঞ্চলের মানুষদের, অপুষ্টির মোকালায় বাড়িতে বাড়িতে 'পুষ্টিবাগান' তৈরির চেষ্টা চলছে। চলছে জুঁই

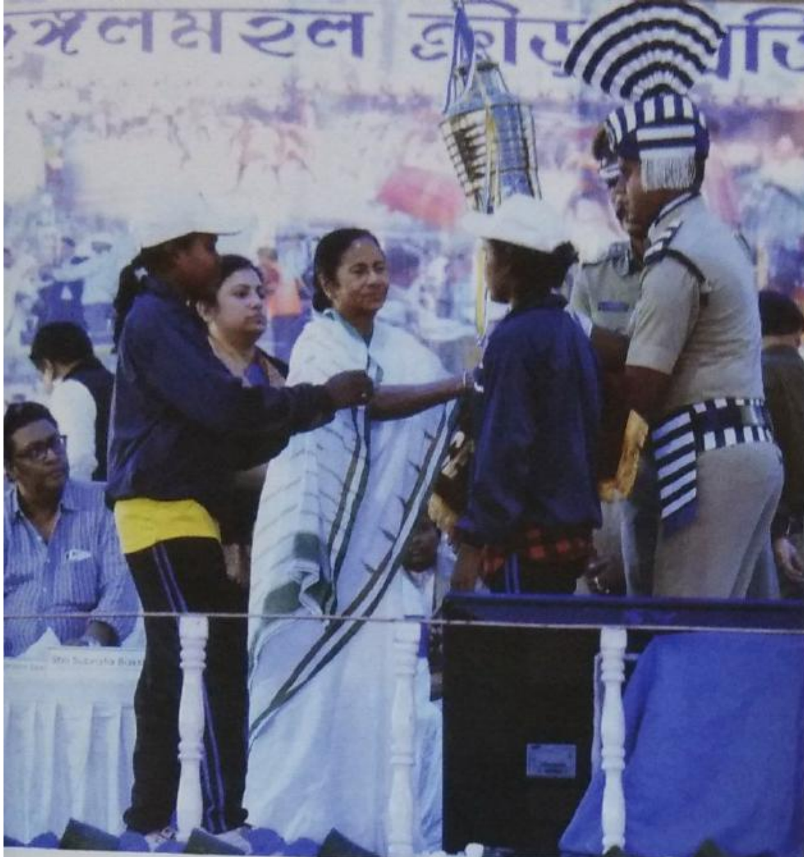

ফুল, বেল ফুলের চাষের উদ্যোগ। বাঁকুড়া জেলার প্রান্তিক অঞ্চলের ফল, ফুল হয়তো অচিরেই বিদেশে রপ্তানি হবে বেশি করে।

'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ জঙ্গলমহলকে আরও বেশি করে চাষযোগ্য করে তুলেছে। বৃষ্টিবিহীন সময়েও চাষ সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া, কম জলে কিভাবে চাষ করা যায় কৃষি বিজ্ঞানীরা তাঁদের সেসব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিতও করেছেন। বাড়ির কাজে ব্যবহৃত জল অপচয় না করে বাড়ির চারপাশের জমিতে শাক-সবজি চাষের জন্যও তাঁদের মধ্যে উদ্যম তৈরির চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এইভাবে জীবন-যাপনের মান-উন্নয়নের সূক্ষ্ম সম্পর্কও যে কতটা তাও তাঁদের বোঝানো হচ্ছে। একদিকে অপুষ্টির মোকাবিলা, অন্যদিকে খাদ্যতালিকায় সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবারের পরিমাণ বৃদ্ধির কাজ চলছে সমানতালে।

প্রাণীসম্পদ দপ্তর গবাদি পশু ও প্রাণী দিচ্ছে পালনের জন্য। উন্নতপ্রজাতির এইসব পশু ও প্রাণী পালনের জন্যও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জঙ্গলমহলের মানুষদের এইভাবে চিরাচরিত কর্মসংস্কৃতির মাধ্যমে উন্নয়নের কাজ চলছে। প্রাণীবিজ্ঞানের ফলিত গবেষণার সুফল আজ তাঁদের জীবনের অন্যতম দিশা হয়ে উঠছে।

জঙ্গলমহলে ঝোরা, নালা, ছোটো ছোটো নদীর অভাব নেই। এখন আবার নতুন সংযোজন—জলতীর্থ। জল ধরে রাখার জন্য বড়ো বড়ো পুকুর খনন করে মাছ চাষ, পাড়ে উদ্যান বা বাগিচা ফসল ফলানের পাশাপাশি গ্রামের সৌন্দর্যায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের নানা কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

কৃষি ঋণ, ফসল বীমা যোজনা, সরকারের কাছে ন্যায্যমূল্যে ধান বিক্রি—জঙ্গলমহলের মানুষের জীবনছন্দকেও দোলা লাগিয়েছে। দারিদ্র্যকে নানাভাবে মোকাবিলা করার জন্যও ক্রমশ তৈরি হয়ে উঠেছেন তাঁরা। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বার্ধক্য পেনশন পাচ্ছেন। সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ, বয়স্ক মানুষদের 'সমব্যথী'-র টাকা পাওয়া যাবে—কিছুটা আত্মসম্মানের সঙ্গে তো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারবেন, এই বোধ তৈরি হয়েছে তাঁদের মধ্যে। এটা করতে পেরেছে বর্তমান সরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের মানবিক মুখ জঙ্গলমহলকে ধীরে ধীরে আত্ম-জাগরণের পথে নিয়ে চলেছে।

আজ তাঁরা নানা কাজে যুক্ত হচ্ছেন। অনেক পরিবারের সদস্যই চুক্তিভিত্তিক-সরকারি কর্মী হিসাবে কাজের সুযোগ পেয়েছে। যুবসম্প্রদায় উপলব্ধি করতে পারছে যে তারা কাজের জন্য উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তুলতে পারলে জঙ্গলমহলের সুদিন ফিরবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই প্রকৃত অর্থে তাদের দিন বদলে দিতে পারে। ইংরেজি ভাষা শিখতে তাদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষার জন্য এটা সুবিধা তৈরি করে দে[illegible] আবার, অলচিকি হরফে সাঁওতালি ভাষা চর্চার আগ্রহও তাদের মধ্যে বাড়ছে। জঙ্গলমহলে সাঁওতালি ভা[illegible]ষীর সংখ্যা সর্বাধিক। মাতৃভাষার বন্ধনে নিজেদের বাঁধতে তাঁরা আগ্রহী। তাঁদের সঙ্গে আছে সরকারি উ[illegible]। অলচিকি হরফে স্কুলপাঠ্য বই তৈরি হয়েছে। রাজ্যের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাও দেওয়া যাচ্ছে এই লি[illegible]তে। নানা সরকারি কাজকর্মে এই লিপির বহুল ব্যবহার হচ্ছে।

[illegible]রুক ভাষা ওঁরাও জনজাতির মাতৃভাষা। সরকার এই ভাষাকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। তৈরি হয়েছে কুর্মি বোর্ড। তৈরি হয়েছে সাঁওতালি আকাডেমি। সাঁওতালি অভিধান হয়েছে অলচিকি হরফে।

নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনচর্যায় মেতে আছে জঙ্গলমহল। উন্নয়নের এই ধারা সেখানকার মানুষেরা নিজেদের জীবনের সবক্ষেত্রে বইয়ে দিতে তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাদের জয় ঘোষণা করেছে সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে।

নিখরচায় সেরা পরিষেবা, সরকারি হাসপাতালে মানুষের ঢল

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মরা গাঙে নতুন করে জোয়ারের জল সঞ্চারিত হয়েছে। মাত্র ৭ বছর সময়ের মধ্যেই আমূল বদলে ফেলা সম্ভব হয়েছে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর খোলনলচে। কারণ, নতুন সরকারের কাছে কাজের মূল লক্ষ্যই হল, সামগ্রিকভাবে মানুষের কল্যাণ। আর তাই 'সবার জন্য স্বাস্থ্য'— চলার পথে এটাই মূলমন্ত্র।

বিনামূল্যে চিকিৎসা:

জেলায় জেলায় সরকারি হাসপাতালগুলিতে এবং সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মানুষ আজ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং ওষুধপত্র পেতে পারেন। নতুন সরকারের এ এক সাহসী ও নজিরবিহীন পদক্ষেপ। নিকটজনের অসুস্থতার সময় অর্থের সংস্থান করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে যাতে কোনওভাবেই বিপদে পড়তে না হয়—তার জন্যই সরকারের এই মানবিক প্রয়াস। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সরকারের একটি ছোট্ট পদক্ষেপ। এই সুবিধা দিতে ২০১১-১২ সালে ২৯৬.১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।

২০১৭-১৮ সালে সেই বরাদ্দের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫৭.৮৩ কোটি টাকায়। সরকারি হাসপাতাল চত্বরেই প্রাইভেট পাবলিক মডেলে ১২২টি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান এবং ৯৫টি ন্যায্যমূল্যের ডায়গনস্টিক সেন্টার তৈরি করে ওষুধ, কৃত্রিম অঙ্গ এবং ডায়াগনস্টিক পরিষেবাকে মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এনে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর প্রভূত উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে ২৭ হাজার শয্যা বেড়েছে হাসপাতালে। আর মোট শয্যার সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে এক লক্ষের মানদণ্ড।

শুধু তাই নয়, রাজ্যের নানা প্রান্তে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। এগুলি ৩০০-৫০০ শয্যাবিশিষ্ট। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ৩৯টি মাল্টি/সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আউটডোরে পরিষেবা এবং ৩৬টিতে ইনডোর পরিষেবা চালু করে দেওয়া গিয়েছে। এমনকি, মহকুমাস্তরের হাসপাতালেও এ রাজ্যের মানুষ এখন ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট-এর (সিসিইউ), হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট-এর (এইচডিইউ) পরিষেবা পেতে পারেন। মনে রাখতে হবে, এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে জেলা বা মহকুমা স্তরের কোনও হাসপাতালেই সিসিইউ ছিল না। ইতিমধ্যেই ৭টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ খোলা হয়েছে। খোলা হবে আরও ৯টি।

মা ও শিশু:

মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের যত্নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে বর্তমান সরকার।

২০১১ সালের আগে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যেখানে এসএনএসইউ-এর কোনও অস্তিত্বই ছিল না— আজ সেখানে এসএনএসইউ অর্থাৎ সিক নিউবর্ন স্টেবিলাইজেশন ইউনিটের সংখ্যা ৩০৭। শীঘ্রই খোলা হবে এমনই আরও ৫টি ইউনিট।

শুধু তাই নয়, রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে গর্ভবতী মায়েরা যাতে নিরাপদে সঠিক সময়ের মধ্যে প্রসবের জন্য সরকারি হাসপাতালে পৌঁছে যেতে পারেন— তার জন্য প্রতীক্ষাগৃহ তৈরি হচ্ছে। ৩টি প্রতীক্ষাগৃহ ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। এর ফলে প্রসবকালীন জটিলতাও বেশ কিছুটা কম করা গিয়েছে। গর্ভবতী মায়েদের পাশে দাঁড়াতে পেরে এই সরকার গর্বিত।

মা ও শিশুর যত্নের প্রতি নজর রাখতে এই সরকারের প্রয়াস অত্যাধুনিক সুবিধাবিশিষ্ট 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব'। গোটা রাজ্যে এমন ১৬টি হাব তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। তার মধ্যে এখন চালু আছে ৭টি।

এখানেই শেষ নয়। সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট বা এসএনসিইউ-এর সংখ্যা সরকারি স্তরে এখন ৬৮। এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে যেখানে এই সংখ্যা ছিল ৬। সব মিলিয়ে বর্তমানে ২০৯৮টি শয্যাবিশিষ্ট এসএনসিইউ পুরোদমে চিকিৎসা পরিষেবায় যুক্ত রয়েছে রাজ্যে।

রাজ্যের ১৩টি মেডিক্যাল কলেজ ও ডা. বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতাল এবং চিত্তরঞ্জন সেবাসদন মিলিয়ে ৪টি-তে এবং আরও ১১টি প্রতিষ্ঠানে পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (PICU) চালু আছে। শুধুমাত্র অসুস্থ নবজাতকদের জন্য ৩০টি হাসপাতালে নবজাতক বিভাগে ৭৮০টি শয্যার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই সব নানা পদক্ষেপ করার ফলে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এ রাজ্যের নতুন সরকার। প্রায় তলানিতে ঠেকে গিয়েছিল মানুষের বিশ্বাস। বিন্দু বিন্দু করে সেই বিশ্বাস আজ আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। বিপদের সময় মানুষের আশাভরসার জায়গা আজ আবার সেই সরকারি হাসপাতাল-ই।

ফলে একইভাবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের পরিসংখ্যানও ২০১০-এর ৬৫% থেকে বেড়ে ৯৫ শতাংশ ছুঁয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর হার। নবজাতকের মৃত্যু প্রতি হাজারে ২৫-এ নেমে এসেছে। ৯৪ শতাংশ শিশুকে টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় আনা গিয়েছে। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও এই অগ্রগতির নজির আজ এই সরকারের পাথেয়। মানুষের সেবায়, মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করার এ এক দৃঢ় অঙ্গীকার।

মানবসম্পদ উন্নয়ন:

পরিকাঠামোগত উন্নতির পাশাপাশি নজর দেওয়া হয়েছে পেশাদার ও দক্ষ কর্মী এবং চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকেও। প্রাথমিকভাবে বর্তমান মেডিক্যাল অফিসারদের ধরে রাখার জন্য তাঁদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বিগত ৬ বছরে এখনও পর্যন্ত ১৫ হাজার মেডিক্যাল ও প্যারা মেডিক্যাল কর্মী নিয়োগ করেছে হেল্‌থ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। এটি একটি নজিরবিহীন পদক্ষেপ।

সরকারের দরদী মন:

এ রাজ্যের প্রতিটি শিশুকে সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর এক জীবনের সুযোগ করে দিতে বদ্ধপরিকর বর্তমান সরকার। এই প্রচেষ্টারই নতুন সংযোজন শিশুসাথী প্রকল্প।

১৮ বছর বয়স পর্যন্ত কোনও শিশুর কনজেনিটাল কার্ডিয়াক ডিজিজ, ক্লেফট লিপ/প্যালেট এবং ক্লাব ফুট সংক্রান্ত শারীরিক কোনও সমস্যা থাকলে— এই প্রকল্পের আওতায় তার অস্ত্রোপচার এবং চিকিৎসার যাবতীয় দায়দায়িত্ব নেবে সরকার। এক্ষেত্রে পরিবারের আয়ের কোনও বিধিনিষেধ রাখা হয়নি। অর্থাৎ, শিশুটির পরিবারের আয় বেশিই হোক বা কম, এক্ষেত্রে কোনও ভেদাভেদ থাকছে না। ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে পথ চলা শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের এই প্রকল্প। এখনও পর্যন্ত ১২ হাজারেরও অধিক শিশু এই প্রকল্পের ছত্রছায়ায় চিকিৎসা করাতে পেরেছে।

মধুর স্নেহ:

পূর্ব ভারতে প্রথম এবং দেশের মধ্যে সব থেকে আধুনিক মানবদুগ্ধ ব্যাংক তৈরি হয়েছে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। এবং তা সম্ভব হয়েছে নতুন সরকারের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায়। রয়েছে পাস্তুরাইজেশন, আধুনিক পদ্ধতিতে দুগ্ধ সংগ্রহ, নির্বাচন, প্রক্রিয়াকরণ, পরীক্ষা ও ভাণ্ডারিকরণের সুবিধা। যে সব শিশু নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্মায়, কিংবা যাদের ওজন খুবই কম অথবা যারা জন্মের সময় দুর্ভাগ্যবশত নিজের মাকে হারায় বা যাদের মায়েরা কোনও কারণে প্রত্যক্ষভাবে দুধ পান করাতে পারেন না—তারা এই প্রকল্পে সঞ্চিত দুধের গ্রহীতা হতে পারে।

স্বাস্থ্যসাথী:

এ রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় কোনও কালেই সরকার নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যবিমার কোনও ভাবনাচিন্তা ছিল না। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই প্রথম সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব করে। শুধু অর্থের অভাবে অসুস্থতার সময়ে নিজের কাছের মানুষকে উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ এনে দিতে পারেন না বহু মানুষ। এই অসহায়তার জ্বালা থেকে তাঁদের মুক্তি দিতেই স্বাস্থ্যসাথী।

আর তাই রাজ্যের কয়েক লক্ষ আইসিডিএস কর্মী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, গ্রিন পুলিশ, রাজ্য সরকারি অশিক্ষক কর্মচারি, সরকার অনুমোদিত চুক্তিভিত্তিক অশিক্ষককর্মী এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টটাইম শিক্ষক ও চুক্তিভিত্তিক পূর্ণ সময়ের শিক্ষক, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্য থেকে হোমগার্ড, আশাকর্মী, অর্থ দপ্তরের অধীনে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক ও ঠিকাশ্রমিক— সকলের মুখেই আজ স্বস্তির হাসি। এই প্রকল্পের স্মার্ট কার্ড নিয়ে সমস্ত সরকারি হাসপাতাল এবং

৭০০-র বেশি বেসরকারি হাসপাতালে সুবিধা পাওয়া যাবে। সুবিধাভোগী এবং তাঁর পরিবারের যে কেউ দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত বছরে ক্যাশলেস চিকিৎসা পাবেন। আবার বিশেষ জটিল রোগের ক্ষেত্রে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া হবে। ক্যানসার, নিউরো সার্জারি থেকে কার্ডিও থোরাসিক সার্জারি—সমস্ত ক্ষেত্রেই এই সুযোগ থাকছে। এ পর্যন্ত ৪০ লক্ষেরও বেশি পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় এসেছেন। এছাড়া আরও ৬২ লক্ষাধিক পরিবার RSBY প্রকল্পে উপকৃত হচ্ছেন। তার মধ্যে ২.৮৬ লক্ষ উপভোক্তা RSBY স্মার্ট কার্ডের সুবিধা নিতে পারছেন।

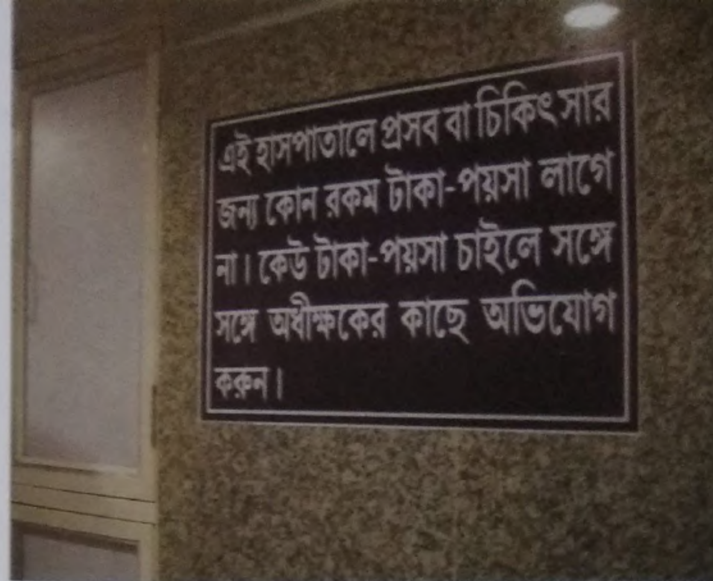

এছাড়া সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যবিভাগ উন্নয়নমূলক কিছু কাজ হাতে নিয়েছে। আর বিভিন্ন শ্রেণির হাসপাতালেই সেই কাজ হচ্ছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (PHC), সাবডিভিশন হাসপাতাল (SDH), স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH) এবং গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)— সর্বত্রই উন্নয়নের এই জয়যাত্রা চলছে। লেবাররুম, অপারেশন থিয়েটার, শৌচালয়, পানীয়জল, বিদ্যুতের সংযোগ—সব মিলিয়ে সাজো সাজো রব। এই সব কাজের জন্য ১৩৩ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে চলতি বাজেটে।

এখানে একটি প্রসঙ্গে আলোকপাত করা খুবই জরুরি। আরজি কর, এনআরএস, ক্যালকাটা মেডিকাল কলেজ, বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ—এই পাঁচটিতে লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর মেশিন আনিয়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ক্যানসার-এর চিকিৎসা শুরু হতে চলেছে। এ রাজ্যের বাসিন্দাদের জন্য এটি একটি সুখবর।

ওয়েস্টবেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এসট্যাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট:

রাজ্যের বর্তমান সরকার সবসময়েই সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের সুখে-দুঃখের ভাগীদার হয়েছে। আর তাদের যে কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য যে মানুষটি সবার আগে নির্দ্বিধায় এগিয়ে এসেছেন, তিনি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এসট্যাবলিশমেন্ট (রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন অ্যান্ড ট্রান্সপেরেনসি) অ্যাক্ট, ২০১৭—তাঁরই চিন্তার ফসল। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মে স্বচ্ছতা আনাই এই আইনের লক্ষ্য।

২০১৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে একটি বৈঠকের পর এই কমিশন গঠনের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিলটি পাশ হয় ৩ মার্চ। বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে বারবারই

সময়সুযোগ মতো সাধারণ মানুষকে হয়রান করার, অকারণে রোগীর প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরীক্ষা-নীরিক্ষা করিয়ে বিল বাড়ানোর এবং নানা সময়ে রোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অমানবিক ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে। কর্তব্যের অবহেলার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর মৃত্যুর জন্যও অভিযোগের আঙুল উঠেছে বেসরকারি হাসপাতালের দিকে। অসহায় মানুষ একাই লড়াই চালিয়ে গিয়েছে কখনও। কখনও আবার হতাশার শিকার হয়ে বাধ্য হয়েছে মাঝপথে লড়াই থামিয়ে দিতে এই প্রথম কোনও সরকার এগিয়ে এল মানুষের সাহায্যে।

বেসরকারি হাসপাতালে অস্বাভাবিক বিলিং-এর প্রবণতা আটকাতে নানাবিধ শর্ত আরোপ করেছে সরকার।

বলা হয়েছে—(ক) পথ দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অ্যাসিড হামলার শিকার হওয়া মানুষ এবং রেপ ভিক্টিমদের চিকিৎসা অবিলম্বে শুরু করতে হবে হাসপাতালগুলিকে—তাঁদের চিকিৎসার খরচ বহনকরার সামর্থ্য থাক বা না থাক। তবে, পরে সেই অর্থ রোগীর পরিবারের সময় সুযোগ মতো আদায় করে নিতে পারবে ওই হাসপাতাল। (খ) বিল না মেটানোর জন্য মৃতদেহ আটকে রাখা যাবে না। (গ) রোগীকে ছুটি দেওয়ার সময় ডিসচার্জ সামারির সঙ্গে চিকিৎসার সমস্ত নথি ও বিশদ বিবরণী দেওয়া বাধ্যতামূলক। (ঘ) বিভিন্ন চিকিৎসার পরিষেবা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট মূল্য বেঁধে দিতে হবে হাসপাতালগুলিকে। কোনও পরিস্থিতিতেই যেন রোগীকে তার অতিরিক্ত মূল্য বহন করতে না হয়। (ঙ) নিতান্ত প্রয়োজন না হলে একই পরীক্ষা যেন একজন রোগীর ক্ষেত্রে বারবার করানো না হয়। (চ) ১০০-র বেশি শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ফেয়ার প্রাইস ওষুধের দোকানে এবং ফেয়ার প্রাইস ডায়াগনস্টিক সেন্টার থাকা বাঞ্ছনীয়। (ছ) প্রতিষ্ঠার সময় সরকারের কাছ থেকে জমি পেয়েছে বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিয়েছে এমন হাসপাতাল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ২০ শতাংশ রোগীকে আউটডোর পরিষেবা এবং ১০ শতাংশ রোগীকে ইনডোর পরিষেবা দিতে বাধ্য থাকবে। (জ) ব্রেন ডেথ হয়ে গেলেও কোনও রোগীকে ভেন্টিলেশনে রাখা হবে কি না—তা নিয়ে রোগীর পরিবারের সদস্যদের অনুমতি নিতে হবে। (ঝ) চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে কোনও রোগীর ক্ষেত্রেই যেন কোনও বৈষম্যমূলক আচারণ করা না হয়। (ঞ) কোনও পরিস্থিতিতেই একজন রোগীকে যেন জীবনদায়ী চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা না হয়।

সাধরাণ মানুষের বিপদের দিনে সরকার এই অস্ত্র তুলে দিয়েছে তাদের হাতে। চিকিৎসার অবহেলা বা হয়রানিতে উদভ্রান্ত মানুষ যেন সেই অস্ত্রের যথাযথ সাহায্য পেতে পারে সরকার সেখানে অতন্দ্র প্রহরী।

২০০৯-১০ বর্ষে এই বিভাগের জন্য যোজনাখাতে ৫৭১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১৭-১৮ তে দাঁড়িয়েছে ৩২৯৯ কোটি টাকায়—যা প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধির সমান। সেখানে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৮,৭৭০.১৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

হোসেল মিঁয়ার বাড়ি সোগরা গ্রামে। ১০০ দিনের কাজের জোগানির। হাড় ভাঙা পরিশ্রম। এতদিন নিজে স্বাস্থ্য পরিষেবার কোনও সুযোগ পানই নি। এমনকী নিজের প্রসূতি স্ত্রীকেও সন্তান প্রসবের সময় নিয়ে আসতে হয়েছিল ২৫ কিলোমিটার দূরে, বাঁকুড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে।

নতুন রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বাংলার হাজার হাজার হোঁসেল মিঁয়াদের মত প্রান্তিক মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছেন। স্বাস্থ্য পরিষেবায় আজ সকলের জন্য প্রকল্প। এসেছে স্বাস্থ্যসাথী, শিশুসাথী, সমাজ সাথী, সামাজিক সুরক্ষা যোজনা। বিদ্যালয় শিক্ষক থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্য, সিভিক ভল্যান্টিয়ার্স থেকে হোমগার্ড কিংবা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী সকলেই আজ স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায়। সরকারি হাসপাতালে এখন সমস্ত চিকিৎসা তো বিনামূল্যে। সঙ্গে রাজ্য জুড়ে বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও এখন প্রায় ৫০ লক্ষ নানা পেশার মানুষ এই পরিষেবা পাচ্ছেন।

বাড়ছে শিশুদের জন্মকালীন হৃদযন্ত্রের সমস্যা। ব্যথিত মুখ্যমন্ত্রী, চিন্তিত। সিদ্ধান্ত নিলেন, চালু হোক শিশুসাথী প্রকল্প যাতে পরিবারের আয় নির্বিশেষে বাংলার প্রত্যেক শিশু, প্রয়োজনে এই প্রকল্পের আওতায় এসে বিনামূল্যে চিকিৎসা করাতে পারে। অন্যদিকে অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধীনে কেউ হাসপাতালে চিকিৎসার সুবিধা নিতে চাইলে বছরে সর্বাধিক ২০ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে সরকার।

চলছে সমাজসাথী প্রকল্প—যার উদ্দেশ্য দুর্ঘটনা বিমার আওতায় সদস্যদের নিরাপত্তা দেওয়া। সুবিধাভোগীর মৃত্যুতে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে স্থায়ী অক্ষমতার শিকার হলে তাকেও ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় দৈনিক ১০০ টাকা এবং ডে কেয়ার বিভাগে চিকিৎসায় ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ দিচ্ছে রাজ্য সরকার।

টালিগঞ্জের টেলিশিল্পীদের জন্য চিন্তিত মুখ্যমন্ত্রী। তাই তাঁদের জন্যও চালু করলেন স্বাস্থ্যবিমা। এছাড়া পুর এলাকায় স্বনির্ভর গোষ্ঠী, গ্রিন ভলান্টিয়ার্স, বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী, আশা কর্মী, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বল, অর্থ দপ্তরের অনুমতিপ্রাপ্ত ঠিকে শ্রমিক, আইসিডিএস কর্মীরাও আজ স্বাস্থ্যসাথীর আওতায়।

শুধু প্রয়োজন একটু জানা—কোথায় কীভাবে যোগাযোগ করে এই সুবিধা নিতে হবে। হোসেল মিঁয়ার মতো বহু মানুষের মুখে আজ খুশির হাসি। নিজে তো বটেই, শিশু সহ পরিবারের সকলে, এমনকী শ্বশুর শাশুড়িও আজ স্বাস্থ্য বিমা যোজনার আওতায়। সম্প্রতি কেরল অপারেটরদেরও স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ই-প্রযুক্তির হাত ধরে এবং স্বচ্ছতা এনে বাংলার প্রত্যেক মানুষের স্বাস্থ্য আজ সকলের সাথী।

মস্তিষ্ক মৃত্যু এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপন

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বপ্নভোরে যুক্ত হল আর এক নতুন মাইলফলক। সেই সঙ্গে রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থা-নগর পরিকাঠামো এবং কলকাতা ও বিধাননগর পুলিশের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আবার গোটা দেশকে দেখিয়ে দিল—কলকাতাই পারে ইতিহাস গড়তে। ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিতে। প্রয়োজনে গ্রিন করিডোর তৈরি করে একজন মানুষের হৃদয় দিয়ে জীবন বাঁচাতে।

২০১৬-র ৪ নভেম্বর। ইতিহাস তৈরি করেছিল কলকাতা—প্রথম গ্রিন করিডোর তৈরি করে। এরপর অবশ্য বেশ কয়েকবার গ্রিন করিডোর তৈরি হয়েছে। ফের তৈরি হল ২০১৮-র ২১শে মে। এবারেরটা অবশ্য অন্য ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে। পূর্ব ভারতে প্রথম হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন হল পূর্ব কলকাতা বাইপাসের ধারে, ফর্টিস হাসপাতালে—বেঙ্গালুরুতে অপর একজনের ব্রেন ডেথ বা মস্তিষ্ক মৃত্যুর পর। বেঙ্গালুরুর ২১ বছরের যুবক বরুণ ভিকে-র হৃদযন্ত্র সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হল ঝাড়খণ্ডের দেওঘরের বাসিন্দা ৩৯ বছরের দিলদার সিং-এর শরীরে।

গ্রিন করিডোরের মসৃণ পথ। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে মুকুন্দপুরের ফর্টিস হাসপাতাল—১৮ কিলোমিটার পথদূরত্বে ভিভিআইপি মর্যাদায় হৃৎপিণ্ড পৌঁছালো সেখানে। ১৯ মে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে বরুণ ভর্তি হয়েছিলেন বেঙ্গালুরুর স্পর্শ হাসপাতালে। পরদিন সকাল ১১টায় মস্তিষ্ক মৃত্যুর ঘোষণা। বেঙ্গালুরু হাসপাতাল থেকে বিমানবন্দর পর্যন্তও ছিল গ্রিন করিডোর। কলকাতা বিমানবন্দরে নামতেই বিধাননগর কমিশনারেটের পাইলট গাড়ি (WB24R5814) অ্যাম্বুলেন্সের সামনে হুটার বাজিয়ে ঝকঝকে মসৃণ পথ দিয়ে, সুন্দর ট্রাফিকের ব্যবস্থাপনায়, হৃদয় পৌঁছে দিল হাসপাতালে।

চেন্নাইয়ের চিকিৎসকরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের সুন্দর পরিকাঠামোকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অঙ্গ প্রতিস্থাপন বিষয়ে রাজ্যের সিনিয়ার নোডাল অফিসার ডা. অদিতিকিশোর সরকার জানান, আমরা সব দিক দিয়ে সহযোগিতা করেছি। আগামী দিনে রাজ্যে আরও কাজ হবে। রাজ্যে রোটো (ROTTO) এবং জাতীয় স্তরে ইতিমধ্যেই NATIONAL ORGAN AND TISSUE TRANSPLANT ORGANIZATION তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সচেতনতা। কারণ অঙ্গদান এবং অঙ্গপ্রতিস্থাপনের সমস্ত ধরনের পরিকাঠামো আজ এ রাজ্যে তথা কলকাতার বুকে তৈরি।

একজন মুমূর্ষু তাকিয়ে রয়েছে আপনার দিকে। আমরা তাঁকে দিতে পারি সুন্দর একটি জীবন। এবং সেটি অঙ্গদানের মাধ্যমে। এই প্রচার একদিকে যেমন বেড়েছে রাজ্যে, অন্যদিকে পুলিশ-ট্রাফিক-পরিবহণ পরিকাঠামো গ্রিন করিডোর থেকে আধুনিকতম স্বাস্থ্য পরিষেবায় আজ কলকাতা পথ দেখাল অন্য রাজ্যকে।

নতুন সিলেবাস, শিক্ষার্থীদের হাতে নয়া হাতিয়ার রাজ্যের

মাধ্যমিকের ফলাফল কেমন হবে? চিন্তায় বারাবরই কপালে ভাঁজ পড়ে ছাত্রছাত্রীদের এবং একই সঙ্গে অভিভাবকদেরও। পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হলেও রেহাই নেই চিন্তার হাত থেকে। কারণ, মাধ্যমিক বোর্ডের সঙ্গে সর্বভারতীয় বোর্ডগুলির নম্বরের ফারাক। ফলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সবসময়েই প্রতিযোগিতায় এক ধাক্কায় অনেকখানি পিছিয়ে যাওয়া।

ছাত্রছাত্রীদের এই চিন্তা লাঘব করতে এই প্রথম এগিয়ে এল কোনও সরকার। ক্ষমতায় আসীন হওয়ার আগে থেকেই এই ভাবনা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ফলে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়নি। ঠিক দু'মাসের মাথায় প্রথম বিজ্ঞপ্তি। এরপর আরও গোটা চারেক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে গঠিত হল বিশেষজ্ঞ কমিটি। ঠিক হল, একেবারে গোড়া থেকেই শুরু হবে ঝাড়াই-বাছাই। প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত—সমস্ত শ্রেণির পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যবই নিয়ে খুঁটিয়ে বিচার-বিবেচনা করা হবে। প্রয়োজনমতো হবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। একই সঙ্গে ওই কমিটির কাছে রাজ্য সরকারের অনুরোধ ছিল, কমিটির সদস্যরা যেন এ রাজ্যে শিক্ষার মান কেমন, তা বিচার করে নিজেদের মতামত জানান। শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে ঠিক কী কী পদক্ষেপ করা উচিত তাও জানতে চায় সরকার। কী পদ্ধতিতে পঠনপাঠন হবে আর ছাত্রছাত্রীদের গুণগতমান বিচারের পন্থাই বা কী হবে—বিশেষজ্ঞ কমিটি সেসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে।

ওই বছরের ১৮ নভেম্বর কমিটি তার অন্তর্বর্তী রিপোর্ট পেশ করে। স্কুলশিক্ষা দপ্তরে এরপর বিশদে সেই রিপোর্ট নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। কমিটির প্রায় সমস্ত সুপারিশই মেনে নেয় সরকার। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় কাজ। পাঠ্যক্রমের খোলনলচে বদলে ফেলা হয়। সেইমতো ধাপে ধাপে বদলে ফেলা হয় সব ক'টি পাঠ্যবইও।

প্রথম ধাপে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, একাদশ এবং পরের ধাপে অন্যান্য শ্রেণির পাঠ্যবইগুলি পরিবর্তিত হল। জুলাই, ২০১২-র মধ্যে শেষ হয় প্রথম ধাপের কাজ। ২০১৩-র শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হয় তাদের পথচলা আর দ্বিতীয় ধাপের বইগুলি পড়ানো শুরু হল ২০১৪ সাল থেকে। ২০১২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ইনডোর স্টেডিয়ামে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে নতুন বইগুলির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, বইয়ের বোঝায় খুদে পড়ুয়াদের যেন মেরুদণ্ড ভেঙে না যায়—বইগুলি তৈরির সময় সেকথাই মাথায় রাখা হয়েছে।

সত্যিই তাই। প্রথম শ্রেণির জন্য বাংলা, ইংরেজি ও গণিত—সব একসঙ্গে এক বইতে। নাম—আমার বই। একটি শিশু তার চারপাশের প্রকৃতি ও চেনা জগৎ থেকে নিজেই বহু শিক্ষা গ্রহণ করে—দেখে ও শুনে। আবার অনেকক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কেউ তার শেখার এই পদ্ধতিতে সাহায্য করে। 'আমার বই' এই দুইয়ের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছে। শিক্ষক এখানে একজন সহায়কমাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বই'-তে যুক্ত হয়েছে প্রথম শ্রেণির পাঠের উপর ভিত্তি করে তৈরি কিছু কর্মপত্র—যাতে তার অর্জিত জ্ঞানের পুনরালোচনা করা যায়। আবার, শিক্ষার উপকরণ এবং কর্মপত্র এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে শিশুর অলক্ষ্যেই তার সামগ্রিক— মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

তৃতীয় শ্রেণি থেকে পৃথক পৃথক বিষয়ভিত্তিক বই তৈরি করা হয়েছে। যুক্ত হয়েছে পরিবেশ শিক্ষার পাঠ-ও। উল্লেখ্য, একটি শিশুর কাছে তার পরিবেশ একটা সামগ্রিকতা বহন করে আনে। ইতিহাস মিশে যায় ভূগোলে, পরিবেশ মিশে যায় বিজ্ঞানে। আর এই মিলমিশের মধ্যেই থেকে যায় শিশুর কৌতূহল মেটানোর অফুরান সম্ভার। আমাদের পরিবেশ বইতে এই সমগ্রতা ধরে রাখারই ঐকান্তিক চেষ্টা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, '... ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই, তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে; নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না।'

নতুন পাঠ্যক্রম ও বই রচনার ক্ষেত্রে এই ভাবনাই মাথায় রাখা হয়েছে।

পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কমিটি সমস্ত বইয়ের ক্ষেত্রেই খেয়াল রেখেছে—যাতে বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না হয়। আর পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত অংশ যে

মুখ্যমন্ত্রীই যখন শিক্ষয়িত্রীর আসনে

ছাত্রছাত্রীর মনের স্বাধীনতাকে ব্যাহত না করে—বরং তাদের ভাবনাচিন্তার ধারাকে উন্মুক্ত ও প্রসারিত করতে পারে। নানা বিষয়ের পাঠ যেন তাদের ভাবায়—আলোড়িত করে। কারণ এভাবেই তৈরি হবে একটি শিশুর মনের নিজস্ব অভিব্যক্তি।

পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের সময় নতুন বইতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বইয়ের অলংকরণের প্রতি। বিশেষ করে প্রাথমিক বিভাগের বইগুলিতে। শিশুমনের প্রাথমিক জড়তা কাটাতে এই ছবিই হবে চাবিকাঠি—এমনটাই ভাবনাচিন্তা করেছেন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদেরা। ছবি আর সত্যিকারের সেই বস্তুর মধ্যে মিল আর অমিল খুঁজতে খুঁজতেই যাতে তারা নিজেদের প্রশ্নের জবাব পেয়ে যায়—সেটাই মূল লক্ষ্য।

প্রাথমিকের পাঠের ক্ষেত্রে দলগত শিক্ষার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পাঠ্যক্রমে। গাছ নিয়ে পড়াতে গেলে একজন শিক্ষক যেন ছবির সাহায্য নেন, ধাঁধার মাধ্যমে শেখান—আবার প্রয়োজনে প্রকৃতির মধ্যে, সত্যিকারের গাছের সামনে নিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় পাঠ দেন ছাত্রছাত্রীদের-শিক্ষকদের এমনভাবেই পড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কোথাও কোনও চাপ নয়—আনন্দদায়ক পরিবেশ তৈরি করে খেলার মাধ্যমে চলবে পঠনপাঠন। আর শিক্ষার পদ্ধতি কখনওই যেন একতরফা না হয়—পড়া আর হাতে-কলমে চর্চা—এই দুইই চলবে সমান তালে।

বিশেষজ্ঞদের মত, 'পাঠ্যবইয়ের রসহীন, আনন্দহীন এবং আতঙ্কময় তথ্য-তত্ত্বের মুখস্থ বিদ্যাচর্চা কোনওক্রমেই বিদ্যাশিক্ষা নয়।' তাই নতুন পাঠ্যবই এবং তার অনুশীলনী নির্মাণের ক্ষেত্রে সেই পুরোনো প্রথাগত ভাবনাকে বর্জন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তবে, নতুন পাঠ্যক্রমে একজন শিক্ষকের গুরুত্ব যেন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বই, খাতা ও শিক্ষার নানা উপকরণ এবং প্রকৃতির মধ্যে, বাস্তব পৃথিবীর মধ্যে শিক্ষককে সেতু হিসাবে

দাঁড় করাতে চেয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। একটি শিশুর মনে নানা প্রশ্ন তুলে দেবেন তিনি। ছাত্রছাত্রীরা সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবে—কখনও এককভাবে, কখনও দলগতভাবে। শিক্ষক হবেন তাঁদের সহায়ক। ন্যায়-অন্যায় বোধ নিয়ে পাঠের ফাঁকেই তিনি তৈরি করে দেবেন বিতর্ক। শিক্ষার্থীদের তর্কে অংশ নিতে এবং মতামত প্রকাশ করতে উৎসাহ দিতে হবে তাঁকেই। ছাত্রছাত্রীদের যাতে মুক্ত বহির্দৃষ্টি তৈরি হয়, যে কোনও পাঠ ও কাজে তারা যাতে কর্তৃত্বভার তুলে নিতে পারে, সেই শিক্ষাও দেবেন একজন শিক্ষকই। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের জীবন অভিজ্ঞতা, প্রকৃতি আর বিশ্বভুবনকে সংযুক্ত করার গুরুদায়িত্ব নিতে হবে তাঁকেই। ফলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে কমিটি। কমিটির রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হয়েছে, শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া না হলে ছাত্রছাত্রীদের এই নতুন পাঠ্যক্রমে শিক্ষিত করে তুলতে শ্রেণিতে তাঁরা কার্যকর ও যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন না।

পাঠ্যক্রমের এই পরিবর্তন শুধু যে বইয়ের ভোলবদল ঘটিয়েছে তা নয়—বদলে গিয়েছে শ্রেণিকক্ষের সংস্কৃতি। শ্রেণিকক্ষ মানে আজ প্রাণচঞ্চল, জানতে, বুঝতে আর পড়তে উৎসুক একরাশ কচিকাঁচা। ছাত্রছাত্রীরা যখন শিশু থেকে কিশোর হওয়ার পথে তখন তাদের মনোজগতে অবিরত যে সব খেলা চলে নতুন পাঠ্যক্রমে সেই ভাবনার সঙ্গেও তাল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকৃতির মেঠো পথ ধরে শিশু-কিশোরের অভিযান, প্রকৃতির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব, উদার মাঠে হইহই করে খেলে বেড়ানোর ছবি বইয়ের পাতায় পাতায়। স্বদেশ ও স্বাধীনতা, মনীষী ও বিপ্লবীদের জীবনকথা এবং দুঃসাহসী মানুষের বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাদের চার দেওয়ালের সীমানা ভেঙে খোলা আকাশের নীচে এক প্রাণচঞ্চল জীবন কাটাতে উৎসাহী করে তুলবে।

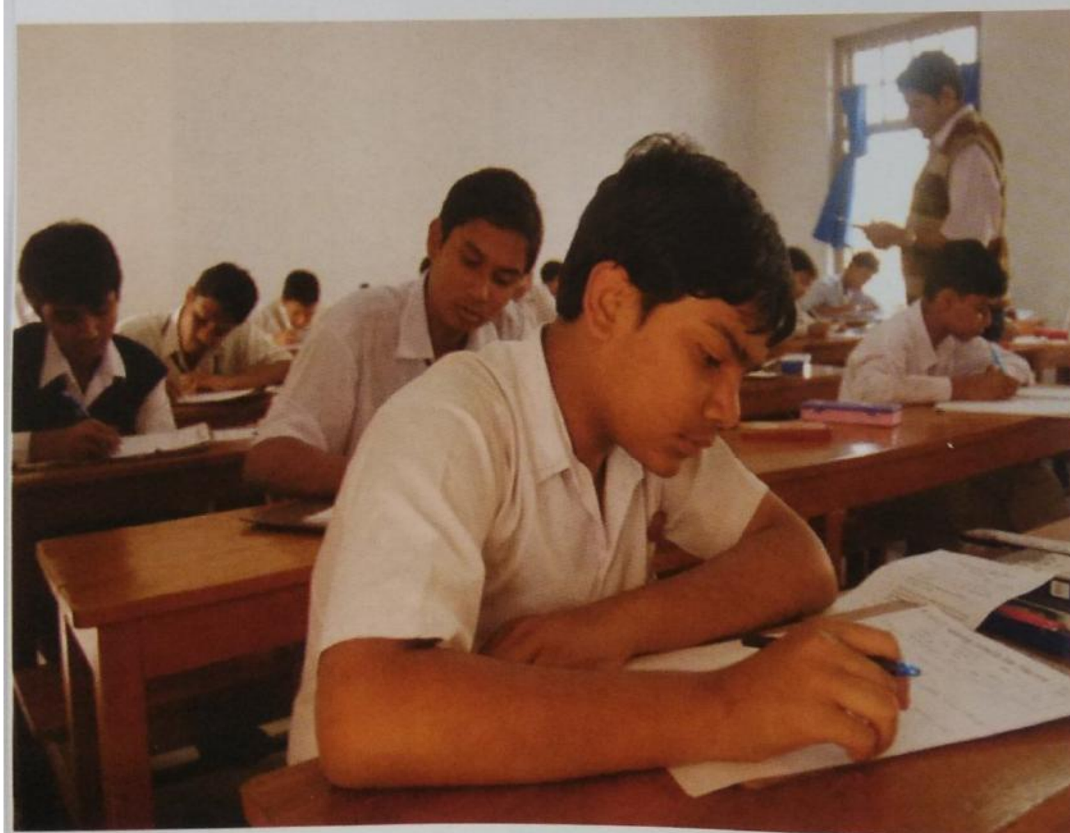

মাধ্যমিক বোর্ডে পড়াশোনা করতে ছাত্রছাত্রীরা যাতে উৎসাহী হয়, তার জন্য এবং একই সঙ্গে তাদের উপর পরীক্ষার চাপ কমাতে কমিটির পরামর্শ—ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি, বাংলা এবং অন্যান্য ভাষার পরীক্ষাগুলিতেও সঠিক উত্তরের জন্য সম্ভব হলে পুরো নম্বর দেওয়া হোক। আবার, প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে আংশিক নম্বর দেওয়া চালু করার প্রস্তাবও দিয়েছেন তাঁরা। অর্থাৎ কোনও প্রশ্নের বিশেষ করে অংকের ক্ষেত্রে উত্তর যথাযথ না হলেও যদি পদ্ধতি সঠিক হয়, তাহলে আংশিক নম্বর পাক ছাত্রছাত্রীরা।

পাঠ্যক্রম কমিটির মতে, ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান তাদের নম্বর দিয়েই বিচার করা হয়। এই অবস্থায় তাঁদের পরামর্শমতো রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তরের পরিবর্তে কনসেপ্ট

এবং অ্যাপ্লিকেশনভিত্তিক প্রশ্নের উপরে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে।

ফলে মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রে এসেছে বিশাল পরিবর্তন। এমসিকিউ এবং সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মত, সংক্ষিপ্ত বা অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই পাঠ্যপুস্তক পড়তে হবে। এতে তাদের প্রাইভেট টিউশন-নেওয়ার প্রবণতা কমবে এবং একই সঙ্গে কমবে সাজেশন বই কেনার ঝোঁক।

মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে যে সুবিশাল ফারাক আগে ছিল— এই বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রস্তাবে সেই ফারাক কিছুটা হলেও কমানো সম্ভব হয়েছে।

প্রতিটি বিষয়ে ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার পরিবর্তে আনা হয়েছে, মূলত প্রোজেক্ট ওয়ার্ক এবং কিছুক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সারা বছরের কাজের মূল্যায়ন।

বিষয়বস্তু উপস্থাপনের প্রয়োজনে বইয়ের মধ্যে নানা জায়গায় 'টুকরো কথা' বলে কিছু 'অতিরিক্ত জ্ঞান' ছাত্রছাত্রীদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব, শিক্ষার্থীরা যেন সেগুলি মুখস্থ না করে। পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে এই অতিরিক্ত জ্ঞান অংশ থেকে প্রশ্ন না করার প্রস্তাব দিয়েছেন তাঁরা।

শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের কাজ, প্রশ্ন করা, অন্যকে সাহায্য করা, বিদ্যালয় ও তার আশপাশের পরিবেশকে প্রতিনিয়ত সুন্দর করে তোলার মধ্য দিয়েও ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন করার কথা বলা হয়েছে।

প্রতিটি শ্রেণিতেই ছাত্রছাত্রীরা যাতে গণিতের পাঠ্যক্রমে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠে তার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যক্রম তৈরি হয়েছে। বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীর চিন্তা বা যুক্তি যেন

কোনওভাবেই আটকে না যায়, সে যেন মুক্ত চিন্তায় ভাবতে পারে, সেদিকে শিক্ষকদের খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। গণিত-শিক্ষা যেন কখনওই ছাত্রছাত্রীদের ভয়ের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়—সেদিকেও নজর রাখতে হবে তাঁদের। শিক্ষার্থীরা যদি প্রতিটি অধ্যায় থেকে মনে মনে অংক (মানসাংক) করতে শেখে তাহলে তাদের চিন্তা, যুক্তি ও গণনা করার ক্ষমতা তাড়াতাড়ি তৈরি হবে।

বিশেষজ্ঞদের মত, নতুন পাঠ্যক্রমকে বর্তমান সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তৈরি করা হয়েছে।

শুধু পাঠ্যবইয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের আটকে না রেখে জোর দেওয়া হয়েছে জীবন আর প্রকৃতির পাঠ নেওয়ার প্রতি। পাঠ্যবই আর শিক্ষক সেখানে সহায়ক হিসাবে থাকবেন। নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরা হবেন জীবনের পথে শক্তিশালী যোদ্ধা। তখনই নতুন পাঠ্যক্রমের সত্যিকারের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। সেই পথেই এগিয়ে চলেছে নতুন পাঠে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা।

নতুন ব্যাগ নিয়ে বীরভূমের কাপাসটিকুড়ি স্কুলের ছেলেমেয়েরা

কন্যাশ্রী থেকে নতুন ব্যাগ, জুতো

মুখ্যমন্ত্রীর উপহার হাতে নিয়ে স্কুলের পথে হাসির কলরোল

পূর্ব মেদিনীপুরের মেয়ে নীলমণি মঙ্গল। বয়স ১৩। বাবা অসুস্থ। এ বাড়ি ও বাড়ি কাজ করে পাওয়া মায়ের সামান্য কটা টাকাই সংসারের ভরসা। তাই ঘুচে গেল নীলমণির পড়াশোনা। এমনকি বিয়েরও সব ঠিক। নীলমণি ছুটে গেল স্কুলের হেড মাস্টারমশাইয়ের কাছে। তাকে যে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। শেষে সবাই মিলে বাড়িতে গিয়ে বোঝানোয় তবে কাজ দিল। কন্যাশ্রীর টাকা নিয়ে নীলমণি আজ আবার স্কুলে।

মেদিনীপুর জেলারই আর এক মেয়ে তাপসী—চায় ডব্লিউবিসিএস অফিসার হতে। তার কথায়, 'কোথাও নাবালিকার বিয়ে হচ্ছে শুনলেই সবাইকে জড়ো করব—মেয়ের বাবা-মাকে বোঝাবো—না বুঝলে সোজা চলে যাব পুলিশে। এসব বিয়ে আটকাতেই হবে।'

এভাবেই নিজেদের জন্য আজ উঠে দাঁড়াচ্ছে মেয়েরা। শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে। দার্জিলিং থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা—একই ছবি জেলায় জেলায়। আর জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাদের পাশে আজ এ রাজ্যের সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

ফলে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি আর নেই। সৌজন্যে মুখ্যমন্ত্রীর সাধের কন্যাশ্রী প্রকল্প। ওই একফোঁটা মেয়ের মনের মেঘ-রোদ্দুর নিয়ে ভেবেছিলেন তিনি—নিজের হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও। কন্যাশ্রী প্রকল্প তাই আজ বিশ্বের দরবারে সমাদৃত—নানা সম্মান আর পুরস্কার তার ঝুলিতে।

কী এই কন্যাশ্রী প্রকল্প? মুখ্যমন্ত্রী বললেন—স্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে গেলে ১৩ থেকে ১৮-র মেয়েরা পাবে বছরে ১০০০ টাকা করে। ১৮-র বেশি আবার ১৯-এর কম বয়স যে মেয়েদের, তারা অবিবাহিত থেকে পড়াশোনা চালিয়ে গেলে, পাবে এককালীন ২৫ হাজার টাকা। আর তারও পরে? স্নাতকস্তরে মাসে আড়াই হাজার টাকা বিজ্ঞান বিভাগের মেয়েদের জন্য। আর কলা বিভাগের জন্য মাসে ২ হাজার।

এখন প্রশ্ন, কেন স্কুলের মেয়েদের জন্য এই টাকার ব্যবস্থা করলেন মুখ্যমন্ত্রী? এর প্রথম এবং প্রধান কারণ, বাল্যবিবাহ। ২০০৬ সালে আইন করে বন্ধ করা হয়েছে এই অপচেষ্টা। কিন্তু তলে তলে বহু নাবালিকারই বিপদ ঘনিয়ে আসে। বারে বারে। তাই কন্যাশ্রী প্রকল্প। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে ঠেকিয়ে রাখার মরিয়া চেষ্টা। কারণ, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা গেলে অসময়ে মা হওয়ার ঝক্কিও সামলাতে হবে না ওই মেয়েদের। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ একই সঙ্গে বাড়াবে তাদের আত্মমর্যাদা বোধ। তাই বয়ঃসন্ধির মেয়েরা এখানেই খুঁজে পাচ্ছে নিজেদের সক্ষমতার ছবি। ভালো থাকার মূলমন্ত্র। স্কুলের গণ্ডি পেরনোর পরেও কন্যাশ্রীর মাধ্যমেই মেয়েদের শিক্ষার আলোয় ফের নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে। শুধু স্কুলের পাঠ কোনওমতে শেষ করা নয়—এ যেন তাদের জীবনের পথে তৈরি হওয়ার শিক্ষা। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে একটা আস্ত সংসারের ভার বহন করার শিক্ষা—প্রয়োজন পড়লে যেন ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসতে না হয় তাদের। পড়াশোনার সঙ্গেই প্রয়োজনমতো দেওয়া হয় নানা বৃত্তিমূলক শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির জ্ঞান, শেখানো হয় অর্থনৈতিক পাঠের প্রাথমিক ধাপ।

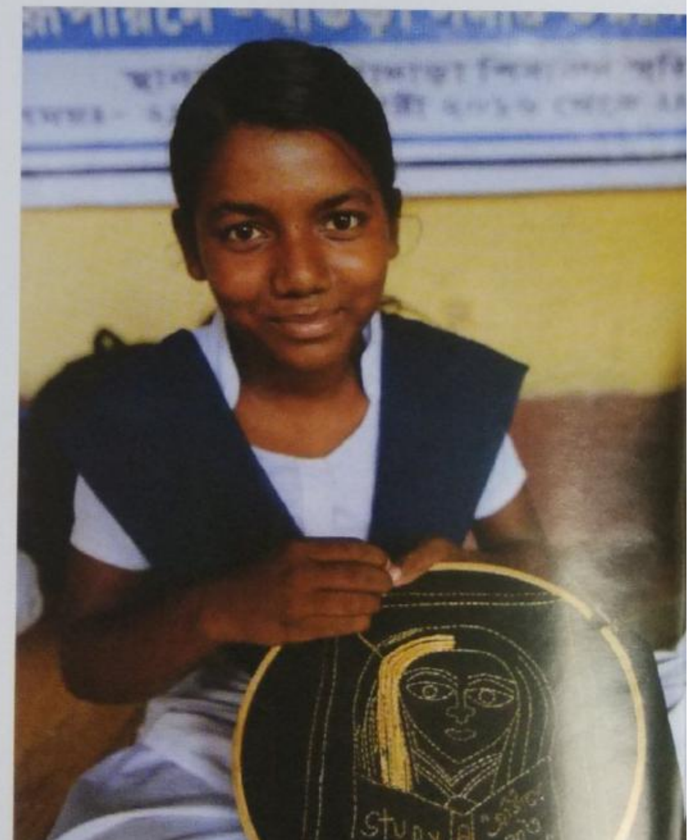

শুধু তাই নয়, এই প্রকল্প আমূল বদলে দিয়েছে মেয়েদের চিন্তাধারা। তৈরি হয়েছে কন্যাশ্রী ক্লাব। স্কুলের মেয়েদের জন্য একটা নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম—যেখানে তারা নিজেদের সমস্যা, আশংকা আর অভিজ্ঞতা অন্যের সঙ্গে মন খুলে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পায়।

(কন্যাশ্রী প্রকল্পের ছবিগুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া।)

আজ এই ভাগ করে নেওয়ার স্বাধীনতাই যেন আগাগোড়া বদলে দিয়েছে তাদের—জোর এনে দিয়েছে মনে—জোর এনে দিয়েছে নিজেদের ভালোর জন্য সমাজের খারাপ দিকগুলোর পরিবর্তন চাইবার জন্য।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাই নাবালিকাদের বাবা-মায়ের মন বদলে দিচ্ছে তারা। তরুণ তুর্কিদের যুক্তির কাছে হার মানছে দীর্ঘদিনের কুসংস্কার। ১৮-র আগে কখনওই বিয়ে নয়—কন্যাশ্রীরা আজ অটল।

গোটা রাজ্যে তাদের সংখ্যা বাড়ছে হইহই করে—৪৮ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৮২ জন (১১ জুন, ২০১৮-র তথ্য অনুযায়ী)।

শিক্ষাশ্রী

শুধু কন্যাশ্রী নয়, পিছিয়ে থাকা পরিবারের সব ছেলেমেয়েরাই যাতে পড়াশোনায় এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৫৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে অন-লাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে মেধাবৃত্তি দেওয়ার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা বছরে ৭৫০ টাকা করে ছাত্রবৃত্তি পাচ্ছে বর্তমানে। আর অষ্টম শ্রেণির জন্য বছরে ৮০০ টাকা।

ফলে তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত পরিবারেও আজ মায়েদের মুখে চওড়া হাসি। তাঁদের ছেলেমেয়েরাও পড়াশোনার সুযোগ নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে—সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে তারা।

স্বামীবিবেকানন্দ স্কলারশিপ

পড়াশোনা করে কে কবে বড়লোক হয়েছে? ছেলে হলে রোজগারের চেষ্টা করুক আর মেয়েরা ঠেলুক সংসারের জোয়াল। চিরাচরিত এই ভাবনার জাল কেটে বেরিয়ে আসার অস্ত্র স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ। শুধু ছাত্র/ছাত্রীর পরিবারের রোজগার বছরে আড়াই লক্ষ টাকার বেশি না হলেই হল। উচ্চমাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর/পিএইচডি নানা স্তরে—নানা মূল্যের বৃত্তি। মাসে সর্বনিম্ন এক হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৮ হাজার টাকা। তবে বৃত্তির জন্য অবশ্যই পেরোনো চাই নির্দিষ্ট শতকরা নম্বরের মাপকাঠি।

ছেলে-মেয়ে দুজনের জন্যই একইভাবে একই হারে বৃত্তির ব্যবস্থা করে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, বিভাজন নয়—শিক্ষার আলোয় আলোকিত হোক উভয়েই। আর উচ্চশিক্ষার প্রাঙ্গণে যেন পৌঁছে যেতে পারে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলেমেয়েরাও। অর্থ যেন যোগ্যতার মাপকাঠি হয়ে না দাঁড়ায় সেখানে।

সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তি

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মেধাবৃত্তি চালু করার উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে এ রাজ্যেই দিশারি। রাজ্যে এমন একাধিক প্রকল্প চালু আছে, যার মাধ্যমে ১.৭১ কোটি সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী উপকৃত হচ্ছে। চলতি বছরে এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৪,৯০০ কোটি টাকা। (সূত্র: অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা, ২০১৮)

বিনামূল্যে বই, স্কুলের পোশাক

পুরুলিয়ার পচাপানি গ্রামে বাড়ি চন্দনা টুডুর। পড়ে দশম শ্রেণিতে। ফিটের ব্যামো আছে। অজ্ঞান হয়ে যায় মাঝে মাঝেই। তবু এই কন্যাশ্রী স্কুলের ফুটবল টিমের একজন নামকরা সদস্য। সেন্টার বা ব্যাক পজিশনে অসাধারণ ভালো খেলে চন্দনা। বাবা ঢাঙ্গা টুডু সামান্য দিনমজুর। মাঠে টুকটাক চাষের কাজও করেন। দুই ভাই আর দুই বোনের মধ্যে চন্দনা ছোটো । স্কুল থেকে বিনামূল্যে বই দেওয়া না হলে পড়াশোনা কি আদৌ চালাতে পারত সে? উত্তর জানা নেই চন্দনার।

প্রাক্-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে ৯ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে রাজ্যের সম[illegible]। আর বিনামূল্যে নতুন স্কুল ইউনিফর্ম। পেয়েছে চন্দনা, কাজলি, অঞ্জলি—সব্বাই।

নতুন স্কুল ব্যাগ, পায়ে স্কুলের জুতো—ছেলেমেয়েদের কোনও অভাব রাখেননি মুখ্যমন্ত্রী। [illegible] ছাত্রছাত্রীদের জন্য দেওয়া হয়েছে বিশেষ পদ্ধতিতে ডিজাইন করা ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক।

মিডডে মিল

স্কুলে বসে দুপুরে পেটভরে খাওয়ার সুযোগ। বর্তমানে রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭১.৮৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৫.৭০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী মিডডে মিলের আওতায়। রান্নার দায়িত্বে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যারা।

এভাবেই শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে মুখ্যমন্ত্রীর মমতাভরা দৃষ্টি। কার কী প্রয়োজন, কীসের অভাবে কোন কাজটা হচ্ছে না— সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্যই আজ তাঁর নখদর্পণে। বাংলার ছাত্রছাত্রীদের অশ্বমেধের ঘোড়া রুখবে কে?

অনলাইনে জাতিগত শংসাপত্র প্রদান

দেশের তপশিলি জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের জন্য সরকার যে সুযোগগুলি চালু করেছেন, সেগুলি পাবার জন্য জাতিগত শংসাপত্রের প্রয়োজন বাধ্যতামূলক। আবেদনের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া হয়। এখন অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে আবেদনকারী যে কোনও জায়গা থেকে সরাসরি জাতিগত শংসাপত্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন www.castecertificatewb.gov.in – ওয়েবসাইটে। আবেদন করার জন্য যাবতীয় তথ্য www.anagrasarkalyan.gov.in-এ বিস্তারিত দেওয়া আছে।

কারা আবেদন করতে পারবে ?

- আবেদনকারীকে ভারতীয় নাগরিক এবং তপশিলি জাতি / তপশিলি জনজাতি / অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত হতে হবে।
- আবেদনকারীকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
- অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির আবেদন করার জন্য কিছু নিয়ম রয়েছে, যা পাওয়া যাবে বিভাগীয় ওয়েবসাইটে।
- আবেদনকারীর কাছে অন্য কোনও প্রমাণ বা নথি না থাকলে কেবলমাত্র আবেদন পত্রটি দিয়েই এই শংসাপত্রের জন্য আবেদন করতে পারেন। স্থানীয় তদন্ত ও শুনানির মাধ্যমে আবেদনপত্রটি বিবেচিত হবে।

কীভাবে আবেদন করবেন ?

- আবেদনকারীকে সর্বপ্রথমে www.castecertificatewb.gov.in ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। সঠিকভাবে আবেদনপত্র পূরণ করে অনলাইনে জমা দিলে, আবেদনকারী সঙ্গে সঙ্গেই একটি স্বীকৃতি-পত্র পাবেন। এই স্বীকৃতিপত্রের দেওয়া ক্রমিক নম্বর ধরে আবেদনকারী পরে, অনলাইনে তাঁর আবেদনপত্রের হাল জানতে পারবেন।

- এরপর আবেদনকারী ওই অনলাইন আবেদনের একটি মুদ্রিত প্রতিলিপি নিয়ে, তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথিগুলির জেরক্স করে রাখবেন। যে নথিগুলির প্রতিলিপি জমা দিতে হবে সেগুলি হল —

- বয়সের প্রমাণপত্র, ছবিযুক্ত কোনও প্রামাণ্য পরিচয়পত্র, ভারতীয় নাগরিকত্বের শংসাপত্র, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসের শংসাপত্র, স্থানীয় বাসিন্দার শংসাপত্র, যদি ভোটার হন, তবে ভোটার কার্ডের প্রতিলিপি, বাৎসরিক আয়ের শংসাপত্র, যদি নিকট কোনও আত্মীয়ের জাতিগত শংসাপত্র থেকে থাকে, তার প্রতিলিপি। এছাড়া সাম্প্রতিককালে তোলা নিজের একটি ছবিও জমা দিতে হবে।

- পৌর এলাকার বসবাসকারীরা তাঁদের নির্দিষ্ট মহকুমাশাসকের অফিসে আবেদনপত্র জমা করবেন। কলকাতা অঞ্চলে বসবাসকারী আবেদনকারী, DWO অফিস, কলকাতা (১, হরিশ মুখার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-২৫) এবং বিধাননগর পুরসভার বাসিন্দারা বিধাননগর মহকুমাশাসকের দফতরে আবেদনপত্র জমা দেবেন।

- আবেদনকারী যদি ব্লক অঞ্চলে বসবাস করেন, তবে তাঁদের নিজস্ব বিডিও অফিসে ওই আবেদন জমা করবেন।

- আবেদনপত্র জমা দিলে, পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা আইন, ২০১৩ অনুসারে অবশ্যই আবেদনকারীকে 'ফর্ম - ১'-এ অবশ্যই স্বীকৃতিপত্র দেওয়া হয়। এই 'ফর্ম–১' টি না পেলে চেয়ে নিন। এটি আপনার অধিকার।

- আবেদনগুলি পরীক্ষা করে যোগ্য মনে হলে, সংশ্লিষ্ট মহকুমাশাসক জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করবেন।

- আবেদনপত্র মহকুমাশাসকের স্তরে বাতিল হলে, আবেদনকারী তাঁর জেলার জেলাশাসকের কাছে এবং কলকাতার ক্ষেত্রে ডিভিশনাল কমিশনার অফিসে পুনর্বিচারের জন্য আবেদন করতে পারেন।

শর্তাবলী প্রযোজ্য

শিক্ষাশ্রী

কে বা কারা পেতে পারে ?

পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও অনুমোদিত স্কুলে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত/পাঠরতা তপশিলি জাতি-জনজাতির ছাত্র-ছাত্রী যাদের পারিবারিক আয় বার্ষিক ২.৫ লক্ষ টাকা থেকে কম, তারাই এই প্রকল্পে বৃত্তি পাবে। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত নয়।

কোথায় আবেদন করবে ?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই অনলাইন ব্যবস্থায় www.anagrasarkalyan.gov.in-ওয়েবসাইটে প্রতিষ্ঠানের সমস্ত যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরাসরি আবেদন করবে।

এই প্রকল্পের সুবিধা কি ?

বৃত্তির পরিমাণ :- বার্ষিক ৭৫০-৮০০ টাকার মধ্যে।

শর্তাবলি প্রযোজ্য

ওয়েবসাইট

www.anagrasarkalyan.gov.in

অন্যান্য স্কলারশিপ

তপশিলি জাতি, জনজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকার বিভিন্ন স্কলারশিপ বা বৃত্তি দিয়ে থাকে। বৃত্তিগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা অন্য কোনও সরকারি স্কলারশিপের জন্য আবেদন করলে এই স্কলারশিপ পাওয়ার যোগ্য হবে না।

স্কলারশিপের নাম	কারা পাবে	স্কলারশিপের সুবিধা	কিভাবে আবেদন করবে
তপশিলি জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ	পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও অনুমোদিত স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণিতে পড়ছে এমন ছাত্র-ছাত্রী, যাদের পারিবারিক আয় বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকার কম।	অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রী:- বার্ষিক ৩০০০ টাকা, আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী :- বার্ষিক ৬২৫০ টাকা	ছাত্র-ছাত্রীরা নিজে www.oasis.gov.in ওয়েবসাইটে সরাসরি আবেদন করবে।
তপশিলি জনজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ	পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও অনুমোদিত স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণিতে পড়ছে এমন ছাত্র-ছাত্রী, যাদের পারিবারিক আয় বার্ষিক দু-লক্ষ টাকার কম।	অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রী:- বার্ষিক ২২৫০ টাকা, আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী:- ৮৫০০ টাকা	ছাত্র-ছাত্রীরা নিজে www.oasis.gov.in ওয়েবসাইটে সরাসরি আবেদন করবে।
অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ	পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও অনুমোদিত স্কুলে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণিতে পড়ছে এমন ছাত্র-ছাত্রী, যাদের পারিবারিক আয় বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকার কম।	অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রী:- বার্ষিক ১৫০০ টাকা, আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী :- বার্ষিক ৫৫০০ টাকা	ছাত্র-ছাত্রীর হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ www.anagrasarkalyan.gov.in-এ আবেদন করবে।
তপশিলি জাতি ও জন জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ	মাধ্যমিক স্তরের পরে, কোনও অনুমোদিত পাঠক্রমে পড়ছে এবং যাদের পারিবারিক বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ টাকার কম, সে-সব ছাত্র-ছাত্রীরা	পাঠ্যক্রম অনুসারে সরকার নির্ধারিত বার্ষিক টিউশন ফি এবং মেন্টেনেন্স ফি দেওয়া হয়।	ছাত্র-ছাত্রীরা নিজে www.oasis.gov.in ওয়েবসাইটে সরাসরি আবেদন করবে।
অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ	মাধ্যমিক স্তরের পরে, কোনও অনুমোদিত পাঠক্রমে পড়ছে এবং যাদের পারিবারিক বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকার কম, সে-সব ছাত্র-ছাত্রীরা।	পাঠ্যক্রম অনুসারে সরকার নির্ধারিত বার্ষিক টিউশন ফি এবং মেন্টেনেন্স ফি দেওয়া হয়।	ছাত্র-ছাত্রীরা নিজে www.oasis.gov.in ওয়েবসাইটে সরাসরি আবেদন করবে।

হোস্টেল

অনগ্রসর কল্যাণ দফতর ও আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের অধীনে সারা পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু আবাসিক হোস্টেল আছে, যেখানে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হয়ে, পড়াশোনা করতে পারে।

আশ্রম হোস্টেল :

প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির তপশিলি ছাত্র-ছাত্রী, যাদের পারিবারিক বার্ষিক আয় ৩৬,০০০ টাকার থেকে কম তারা এই হোস্টেলে থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারে।

এই প্রকল্পের সুবিধা :

হোস্টেলে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক ৭৫০ টাকা হারে ১২ মাসের জন্য হোস্টেল গ্র্যান্ট এবং বিছানা, সাবান, কেরোসিন ইত্যাদি বাবদ অর্থ বরাদ্দ করা থাকে। এছাড়াও আশ্রম হোস্টেলে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, অতিরিক্ত টিউশনের সু-ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্কুল সংলগ্ন হোস্টেল :

তপশিলি জাতি এবং উপজাতির পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণিতে পাঠরত/পাঠরতা ছাত্র-ছাত্রীরা যাদের পারিবারিক আয় বার্ষিক ৩৬,০০০ টাকার থেকে কম তারা শিক্ষা দপ্তরের এই হোস্টেলে থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারে।

এই প্রকল্পের সুবিধা কী?

এই হোস্টেলে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীরা মাসিক ৭৫০ টাকা হারে ১০ মাসের জন্য হোস্টেল গ্র্যান্ট পেয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় হোস্টেল :

মাধ্যমিক স্তরের পরে কোনও অনুমোদিত পাঠ্যক্রমে পাঠরত/পাঠরতা তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা এই হোস্টেলে থাকার জন্য আবেদন করতে পারে। বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে হোস্টেলের সুপার অথবা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রকল্প আধিকারিকের অফিসে আবেদন করতে হয়।

এই প্রকল্পের সুবিধা :

হোস্টেলে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীরা পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপের নির্ধারিত হারেই হোস্টেল গ্র্যান্ট পেয়ে থাকে। এছাড়াও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে ৭টি একলব্য মডেল আবাসিক স্কুল আছে—ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। এই দপ্তরের অধীনেই ৯ টি পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক স্কুল বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া আর জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ি আদিবাসী বালিকা বিদ্যালয়টিও এই দপ্তরের অধীনে আছে।

ড: বি. আর. আম্বেদকর মেধা পুরস্কার :

জনসংখ্যার নিরিখে জেলাভিত্তিক মেধাবী তপশিলি জাতি ও তপশিলি জনজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করার জন্য এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তপশিলি জাতি ও জনজাতির ছাত্র-ছাত্রীরা এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।

শর্ত :

মেধার ভিত্তিতে সারা পশ্চিমবঙ্গে মোট ৭৫০ জন তপশিলি জাতি ও ৭৫০ জন তপশিলি জনজাতির ছাত্র-ছাত্রীকে এককালীন ৫,০০০ টাকা ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এর জন্য প্রকল্প আধিকারিকের অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

শিক্ষাঋণ :

তপশিলি জাতি ও জনজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যে কোনও বৃত্তিমূলক বা কারিগরি পাঠ্যক্রমে পড়াশোনা করলে শিক্ষা ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন।

আবেদনকারী গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করলে, তাঁর পারিবারিক বার্ষিক আয় ৯৮,০০০ টাকা ও শহরে বসবাস করলে বার্ষিক আয় ১,২০,০০০ টাকার মধ্যে যদি থাকে, তবে তিনি এই ঋণ পেতে পারেন। ভারতের যে কোনও জায়গায় পড়াশোনার জন্য সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা আর বিদেশে পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ২০ লক্ষ টাকা অবধি ঋণ পাওয়া যায়।

কীভাবে আবেদন করবে ?

তপশিলি জাতি ও ওবিসি ছাত্র-ছাত্রীরা www.wbscstcopr.gov.in-এ এবং তপশিলি উপজাতির ছাত্রছাত্রীরা www.wbtdcc.gov.in-এ অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। তপশিলি উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীরা সরাসরি আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী সমবায় নিগম অফিসেও (সিধু-কানু ভবন, কে.বি-১৮, সেক্টর-৩, বিধাননগর) যোগাযোগ করতে পারেন।

ঋণ পরিশোধের নিয়ম :

ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ৩.৫%, ছাত্রদের ৪% হারে সুদ-সহ ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

পাঠ্যক্রম শেষ হওয়ার ৬ মাস পরে অথবা চাকরি পাওয়ার পর (যেটা আগে হবে, তার ভিত্তিতে) থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হয়।

জয়েন্ট এন্ট্রান্স কোচিং

তপশিলি জাতি এবং উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীরা যারা, বিজ্ঞান শাখায় দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে অথবা বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করেছে, তাদের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রস্তুত করার জন্য জেলা স্তরে কোচিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

সাধারণ ভাবে মে-জুন মাসে স্থানীয় সংবাদপত্রে এই প্রশিক্ষণে আবেদন করার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। নির্বাচিত আবেদনকারীদের শনি ও রবিবার, প্রতিদিন চারঘন্টার ক্লাস (Mock Test-সহ) নেওয়া হয় নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে।

এছাড়া, ক্লাসে যাতায়াতের জন্য ভাতাও দেওয়া হয় প্রশিক্ষণপ্রার্থীকে।

ডব্লিউবিসিএস ও অন্যান্য সরকারি পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ

এই প্রকল্পে কারা নাম নথিভুক্ত করতে পারে ?

স্নাতক স্তরের আদিবাসী যুবক-যুবতী, যাদের বয়স ৩৮ বছরের মধ্যে।

অন্তর্ভুক্তির জন্য কোথায় আবেদন করতে হবে ?

প্রতিবছর October থেকে November মাসে দৈনিক পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। Offline এবং Online ফর্ম ফিল আপের মাধ্যমে আবেদন করা যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য নির্দিষ্ট সময়ে www.wbtdcc.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যায়।

আবেদনপত্র প্রাপ্তির কতদিন পর থেকে প্রশিক্ষণ শুরু হয় ?

আবেদন করার পর আবেদনকারীদের মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। পরীক্ষার ফল থেকে মেধার উপর ভিত্তি করে ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়। প্রতিবছর January অথবা February মাস থেকে এই প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু হয়, যার মেয়াদ ১ বছর।

এই প্রকল্পের সুবিধা

এটি একটি ১২ মাসের আবাসিক/অনাবাসিক প্রশিক্ষণ। এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা সিভিল সার্ভিস ছাড়াও অন্যান্য সরকারি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নেয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণের সমস্ত খরচ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে বহন করা হয়।

স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

কী ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় :-

তপশিলি জাতি, তপশিলি জনজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের যুবক/যুবতীদের স্বনির্ভর হতে বা বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরি পেতে সাহায্য করে এমন বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রশিক্ষণ হল পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (পিডিপি), ফ্রন্টলাইন হেল্‌থ ওয়ার্কার, প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি সহায়ক, মোবাইল রিপেয়ার টেক্‌নিশিয়ান, নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, রিটেল সেল্‌স (গ্রামীণ উদ্যোগী), সিসিটিভি টেকনিশিয়ান, এলইডি লাইট তৈরি ও সারানোর টেকনিশিয়ান, প্লাম্বিং-অ্যাসিস্ট্যান্ট, সিকিউরিটি গার্ড, সেলাই ও পোশাক তৈরি, বিউটিশিয়ান, অটোমোবাইল রিপেয়ার, ড্রাইভিং, প্লাস্টিকের বিভিন্ন কোর্স ইত্যাদি।

আবেদনকারীকে বিনামূল্যে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনূর্ধ্ব ৬ মাস (কোর্স অনুসারে)। প্রশিক্ষণ শেষে সরকারি সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ও স্বনির্ভর হতে / চাকুরি পেতে সাহায্য করা হয়।

আবেদনকারীর যোগ্যতা

- আবেদনকারীকে তপশিলি জাতি / তপশিলি জনজাতি / অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হবে।
- বয়স :- ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা :- অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি (সাধারণভাবে)।
- পারিবারিক বার্ষিক আয় (সর্বোচ্চ) :- ৯৮,০০০ টাকা (গ্রামাঞ্চলে); ১,২০,০০০ টাকা (শহরাঞ্চলে)।
- আবেদনের নিয়ম
- অনলাইনে সাধারণভাবে বছরের বিভিন্ন সময়ে আবেদন নেওয়া হয় (www.wbscstcorp.gov.in/www.wbtdcc.gov.in)। কর্মসংস্থান / কর্মক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়।

বিঃ দ্রঃ – বিস্তারিত জানতে জেলার প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয় / নিগমের জেলা অফিস / ল্যাম্প্‌স অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। উল্লেখিত ওয়েবসাইটেও এই প্রশিক্ষণের বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে।

পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন বিত্ত নিগম-এর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি

আপনি কী কী সুবিধা পেতে পারেন :

- তপঃ জাতি, তপঃ জনজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত যোগ্য ব্যক্তি দলগত বা ব্যক্তিগত, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগ বা ব্যবসার জন্য সহজ শর্তে ও কম সুদে ঋণ।
- পারিবারিক ও বার্ষিক সর্বোচ্চ আয় ৪৯,০০০ টাকার মধ্যে হলে অনুদানের সুবিধা।

- প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ ও পরিকাঠামো নির্মাণের সহযোগিতা।
- চাকুরিক্ষেত্রে নিয়োগের সুযোগ বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি / শিক্ষা বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ।

কী কী ধরনের উদ্যোগের জন্য ঋণ পাওয়া যায় :

- কৃষি ও কৃষিসহায়ক / ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প (যেমন — ট্রাক্টর / পাওয়ার টিলার ইত্যাদি), মৎস্য /প্রাণী ও পশুপালন।
- ছোটো ও কুটির শিল্প প্রকল্প (যেমন- মুড়ি, চাল, পাঁপড় ইত্যাদি তৈরি)।
- পরিবহণ (যেমন- অটোরিকশা, গাড়ি ইত্যাদি)।
- পরিষেবামূলক প্রকল্প (যেমন- ইন্টারনেট, ধাবা, ঔষধের দোকান ইত্যাদি)।
- ঋণের পরিমাণ কেমন :
- প্রকল্প অনুযায়ী ২০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা।

সুদের হার কি রকম :

- আদিবাসী স্বনির্ভর দল-ভিত্তিক প্রকল্পে (যেসব পরিবারের বার্ষিক সর্বোচ্চ আয় ৪৯,০০০ টাকার মধ্যে) কোনও সুদ লাগে না, সবটাই অনুদান নির্ভর।
- ছোটো ও মাঝারি ব্যবসা / উদ্যোগে সুদের হার সাধারণভাবে ৪-৮% (প্রকল্প অনুযায়ী)
- ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা / সাধারণ শর্তাবলি :
- আবেদনকারীকে ভারতীয় নাগরিক এবং তপঃ জাতি, তপঃ জনজাতি বা অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হবে।
- পরিবারের সর্বোচ্চ বার্ষিক আয় ৯৮০০০/- টাকা (গ্রামাঞ্চল) এবং ১,২০,০০০/- টাকা (শহরাঞ্চলে)।

● আবেদনকারীর বয়স ১৮-৫০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

ঋণ শোধ করার নিয়ম :

● ঋণ পাওয়ার পর থেকে প্রকল্প অনুযায়ী সুদ-সহ ঋণ ৩-৫ বছরের মধ্যে শোধ করতে হবে।

কোথায় যোগাযোগ করবেন :

● সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতি/বিডিও অফিস/নিগমের জেলা ম্যানেজারের অফিস/নিগমের হেড অফিস।

তপশিলি উপজাতিদের জন্য বার্ধক্য ভাতা

আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর গরিব বয়স্ক তফশিলি উপজাতির জন্য এই বার্ধক্য ভাতা প্রদান বিপিএল তালিকাভুক্ত, ৬০ বছর বা তার বেশি বয়স্ক তপশিলি উপজাতির মহিলা বা পুরুষ, এই প্রকল্পে মাসে ১০০০ টাকা করে, তাঁদের নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই টাকা পান। ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদনকারী বিডিও অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। ব্লক কল্যাণ সমিতির অনুমোদন সাপেক্ষে এই ভাতা পাওয়া যায় (শর্তাবলি প্রযোজ্য)।

বনজ সম্পদ সংগ্রহের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদান

কে বা কারা এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন ?

ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার বনজ সম্পদ আহরণকারী তপশিলি জনজাতির সংগ্রহকারী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার জন্য সংগ্রহকারীদের সরকার নির্ধারিত হারে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদান করা হয়।

প্রস্তাবিত বনজ সম্পদের তালিকা :

কেন্দু পাতা, শালপাতা, শাল বীজ, নিম বীজ, কুসুমী লাক্ষা, মহুয়া বীজ, হরীতকী ইত্যাদি।

বর্তমানে এই প্রকল্পটি কেবল কেন্দু পাতা সংগ্রহের জন্য চালু আছে। আগামী মরশুমে এই প্রকল্পটি অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প :

বর্তমানে কেন্দু পাতা সংগ্রহকারীরা পশ্চিমবঙ্গ কেন্দু পাতা সংগ্রহকারীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, ২০১৫-এর আওতাভুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গ কেন্দুপাতা সংগ্রহকারীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প-২০১৫

এই প্রকল্পে কারা নাম নথিভুক্ত করার জন্য আবেদন করতে পারেন ?

ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী কেন্দু পাতা সংগ্রহকারীরাই এই প্রকল্পের অধীনে আর্থিক ও সামাজিক সহায়তা পাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্তকরণের আবেদন করতে পারেন।

নাম নথিভুক্ত করার জন্য কেন্দু পাতা সংগ্রহকারীদের কোথায় আবেদন করতে হবে ?

ইচ্ছুক কেন্দু পাতা সংগ্রহকারীরা নিকটবর্তী যে কোনও ল্যাম্প সমিতি/বিডিও অফিসে নাম নথিভুক্ত করার জন্য আবেদন করতে পারেন।

নাম নথিভুক্তকরণের কতদিন পর থেকে এই প্রকল্পের সহায়তা পাওয়ার অধিকারী হবেন ?

নাম নথিভুক্তকরণের পর ২ বছর ও আবেদনকারীর বয়স ৬০ (ষাট) বছর পূর্ণ হলে তিনি এই প্রকল্পের অধীনে এককালীন আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন।

এই প্রকল্পের অধীনে উপভোক্তারা কী কী সহায়তা পেতে পারেন ?

(ক) নাম নথিভুক্ত করার পর ২ বছর ও বয়স ৬০ (ষাট) বছর পূর্ণ হলে এই প্রকল্পে এককালীন আর্থিক সহায়তা।

(খ) মৃত্যু এবং স্থায়ী প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা।

(গ) উপভোক্তার স্থায়ী অথবা আংশিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে ক্ষতিপূরণ।

(ঘ) উপভোক্তার কঠিন ব্যাধির চিকিৎসার জন্য (উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের শংসাপত্র সাপেক্ষে) আর্থিক সহায়তা।

(ঙ) মাতৃত্বকালীন সুবিধা।

(চ) অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার খরচ।

গতির ডানায় ভর করে এগিয়ে চলেছে 'বিশ্ববাংলা'

'বাংলা' এখন বিশ্ব বাংলা'। পশ্চিমবঙ্গ এখন সম্ভাবনার রাজ্য। যোগ্যতম নেতৃত্বে গতিময় রাজ্য। শিল্প-বাণিজ্য থেকে শিক্ষা, পর্যটন থেকে নগরোন্নয়ন, স্বাস্থ্য থেকে অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা—সর্বত্র আজ অতি দ্রুতগতিতে চলছে উন্নয়ন। আর এই গতিময়তার অন্যতম কাণ্ডারি আজ রাজ্যের পরিবহণ বিভাগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির যোগ্য এবং গতিময় নেতৃত্বে এই দপ্তর শেষ ৭ বছরে দক্ষ, স্বচ্ছ এবং সদা তৎপর পরিবহণ ব্যবস্থা উপহার দিতে বহু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে।

কর্মহীন যুবক যুবতীদের জন্য এসেছে **'গতিধারা'** প্রকল্প। এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে নাম নথিভুক্ত হওয়া যুবক যুবতীরা এই প্রকল্পের আওতায় নিজেরা পাচ্ছেন রাজ্য সরকার এবং বিভিন্ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা। রাস্তায় নেমেছে নিজেদের গাড়ি। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৪ হাজারের বেশি যুবক যুবতী এতে উপকৃত।

বেড়েছে পথনিরাপত্তা এবং সঠিক সময়ে শহরের যে কোনো প্রান্তে দাঁড়িয়ে সরকারি বাস পাওয়ার সম্ভাবনা। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় **'সেভ লাইফ সেফ ড্রাইভ'** প্রচারাভিযান চলছে জোর কদমে। এজন্য বিভিন্ন পুলিশ কর্তৃপক্ষকে পথ নিরাপত্তার বিভিন্ন সরঞ্জাম ও সিসিটিভি ক্যামেরা কেনার জন্য প্রায় ৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ

করা হয়েছে। ফলে বাড়ছে নাগরিকদের মধ্যে পথ নিরাপত্তা। অন্যদিকে চালু হয়েছে নতুন মোবাইল অ্যাপস **'পথদিশা'**। সমস্ত সরকারি বাসে এখন দেখা যায় **ইলেকট্রনিক টিকেটিং মেশিন**। ফলে রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থা এখন অনেকটাই-নিয়ন্ত্রিত।

পরিবহণ দপ্তরের নিজস্ব ই-পরিষেবার কথা যখন এসেই গেল, উল্লেখ করতে হয় **'ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম'**—এর কথা। চালু হয়েছে **ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কার্ড**। মোটর ড্রাইভিং টেস্ট এখন সিসিটিভি-তে ধরে রাখা হয়। গাড়ি রেজিস্ট্রেশনের জন্য চলছে **ই-বাহন** পরিষেবা। জনপরিষেবা এবং পরিবহণ ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য রাজ্যের নতুন ৩ জেলা (পশ্চিম বর্ধমান, কালিম্পং এবং ঝাড়গ্রাম)-এ চালু হয়েছে আঞ্চলিক পরিবহণ অফিস। ২৫টি নতুন মোটর ভেহিকেলস অফিস আজ রাজ্যের নানাপ্রান্তের মানুষকে সরকারি পরিবহণ পরিষেবা দিয়ে চলেছে। এছাড়াও শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুরে দুটি নতুন আঞ্চলিক অফিস চালু হয়েছে। আবার, বিভিন্ন রাজ্য পরিবহণ ইউনিটগুলিকে একত্রিত করে এক ছাতার নীচে এনে গঠন হয়েছে **পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম**।

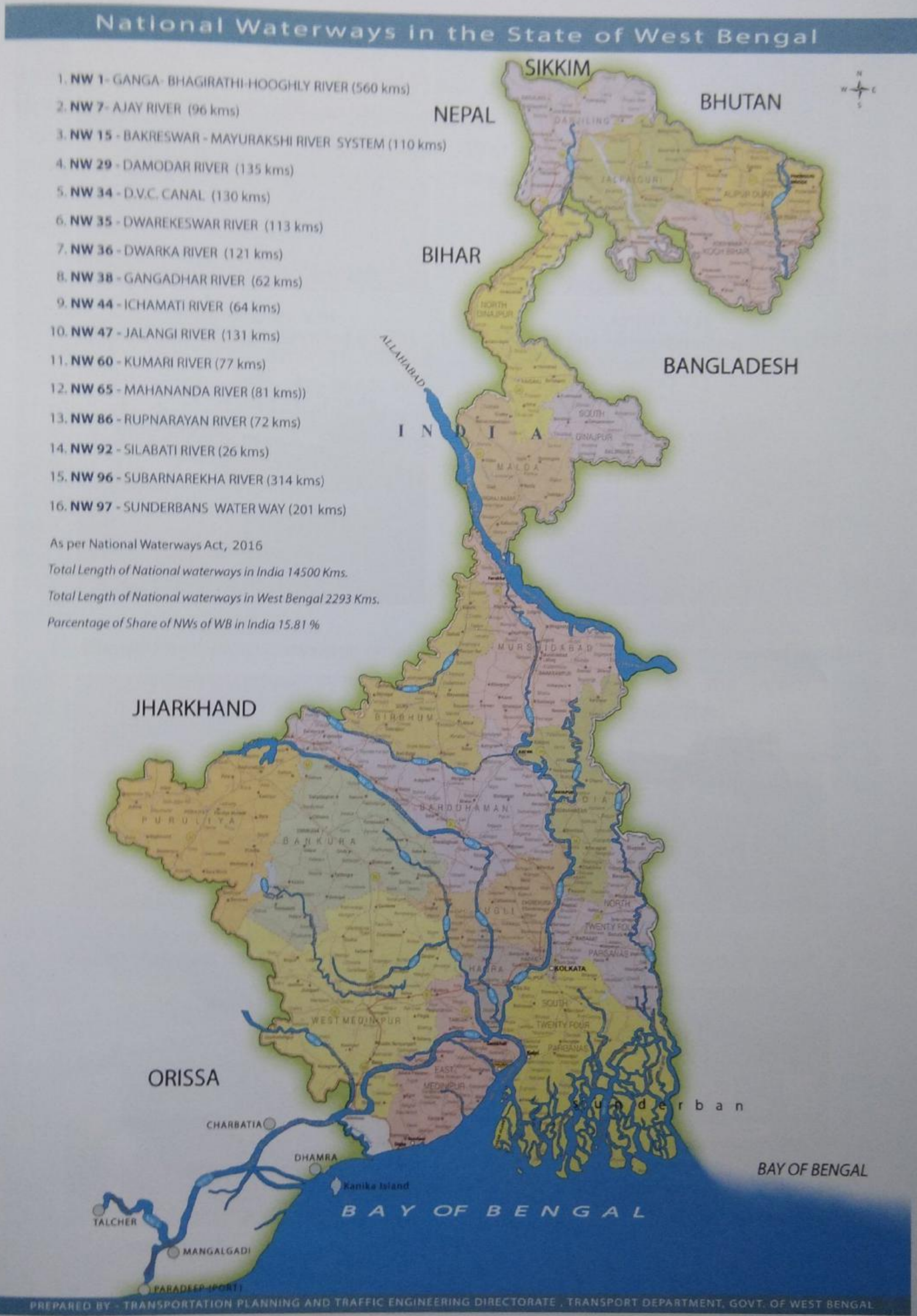
National Waterways in the State of West Bengal
1. NW 1- GANGA- BHAGIRATHI-HOOGHLY RIVER (560 kms)
2. NW 7- AJAY RIVER (96 kms)
3. NW 15 - BAKRESWAR - MAYURAKSHI RIVER SYSTEM (110 kms)
4. NW 29 - DAMODAR RIVER (135 kms)
5. NW 34 - D.V.C. CANAL (130 kms)
6. NW 35 - DWAREKESWAR RIVER (113 kms)
7. NW 36 - DWARKA RIVER (121 kms)
8. NW 38 - GANGADHAR RIVER (62 kms)
9. NW 44 - ICHAMATI RIVER (64 kms)
10. NW 47 - JALANGI RIVER (131 kms)
11. NW 60 - KUMARI RIVER (77 kms)
12. NW 65 - MAHANANDA RIVER (81 kms))
13. NW 86 - RUPNARAYAN RIVER (72 kms)
14. NW 92 - SILABATI RIVER (26 kms)
15. NW 96 - SUBARNAREKHA RIVER (314 kms)
16. NW 97 - SUNDERBANS WATER WAY (201 kms)
As per National Waterways Act, 2016
Total Length of National waterways in India 14500 Kms.
Total Length of National waterways in West Bengal 2293 Kms.
Parcentage of Share of NWs of WB in India 15.81 %
SIKKIM
NEPAL
BHUTAN
BIHAR
ALLAHABAD
BANGLADESH
I N D I A
JHARKHAND
ORISSA
Sunderban
CHARBATIA
DHAMRA
Kanika Island
TALCHER
MANGALGADI
PARADEEP (PORT)
BAY OF BENGAL
B A Y O F B E N G A L
PREPARED BY - TRANSPORTATION PLANNING AND TRAFFIC ENGINEERING DIRECTORATE , TRANSPORT DEPARTMENT, GOVT. OF WEST BENGAL

M.V. ADINA
(Plying between Konnagar and Panihati)

M.V. MEGHBRISTI
(Plying between Cossipur and Belur)

M.V. SURYANADI
(Plying between Manirampur and Sheoraphully)

M.V. MEGHMAA
(Plying between Cossipur and Howrah)

M.V. MOTIJHIL
(Plying between Belur and Kuthighat)

M.V. JUNGAL KANYA
(Placed at Temp. ghat near Iswargupta Bridge)

M.V. ROUDRACHHAYA
(Placed at Haldia jetty Ghat)

M.V. SABUJ SATHI
(Placed at Gosaba ghat)

পরিবহণ ও পর্যটন পরিকাঠামো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে। সুতরাং সেই ভাবনাকে মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রীর গতিময় নেতৃত্বে চালু হয়েছে দুটি আন্তর্জাতিক বাস পরিষেবা—কলকাতা থেকে আগরতলা (ভায়া ঢাকা) এবং কলকাতা থেকে ঢাকা (ভায়া খুলনা)। পথে নেমেছে নতুন প্রায় ২২০০টি বাতানুকূল বাস। এমনকী **রাত্রিকালীন সরকারি বাস** পরিষেবার সূচনাও রাজ্যের পরিবহণ পরিকাঠামোয় আজ নতুন পালক।

আরও দৃঢ়, সুসংহত, সুন্দর, সুষ্ঠু হয়েছে রাজ্যের **জলপথ পরিবহন পরিকাঠামো**। জেটি, ফেরিঘাটগুলিতে একদিকে যেমন যাত্রী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়েছে, অন্যদিকে জেটি সঠিকভাবে পরিচালনের জন্য চালু হয়েছে নতুন নির্দেশিকা। পুরোনো ভুটভুটগুলিকে আধুনিক যন্ত্রচালিত নৌকায় রূপান্তরের জন্য চালু হয়েছে **জলধারা** প্রকল্প। **আন্তর্দেশীয় নৌ-পরিবহণ প্রকল্প** নতুন রাজ্য সরকারের এক যুগান্তকারী ভাবনা। হলদিয়া এবং ফরাক্কার মধ্যে জলপথ পরিবহণের সামগ্রিক উন্নতি ঘটাতে, বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় ৩৫৯১ কোটির প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে হলদিয়া থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত, এই প্রকল্পের প্রথম দফার কাজের জন্য ১০২১ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় অনুমোদন মিলেছে।

অসামরিক বিমান এবং হেলিকপ্টার পরিষেবা রাজ্যের পরিবহণে নতুন দিশা। কম খরচে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে কলকাতা এবং মালদা-বালুরঘাট-দিঘা-গঙ্গাসাগরের মধ্যে চালু হয়েছে হেলিকপ্টার পরিষেবা। সাম্প্রতিক বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্যে সম্মেলনে পর্যটনের কথা মাথায় রেখে জলবিমান চালুর বিষয়ে লগ্নির প্রস্তাব এসেছে স্পাইস জেটের মতো সংস্থার পক্ষ থেকে। অন্ডাল-দুর্গাপুর গ্রীনফিল্ড বিমানবন্দর আজ বাণিজ্যিকভাবে সফল। ২৭টি হেলিপ্যাড খুলে দেওয়া হয়েছে।

পরিকাঠামোর মানোন্নয়নেও অগ্রণী রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। সাঁতরাগাছিতে কলকাতা সেন্ট্রাল বাস টারমিনাস, এজেসি বোস রোড উড়ালপুলের বেকবাগান র‍্যাম্প সেই উদ্যোগেরই ফসল। বছরে আয় বেড়েছে বহুগুণ। ২০১১-১২ সালে ৯৮৬ কোটি টাকা থেকে ২০১৭-১৮ সালে হয়েছে ২২৮৪.৯৮ কোটি টাকা।

ছবি সৌজন্য: পরিবহণ দপ্তর

শহর ও প্রকৃতির মেলবন্ধন, স্বপ্নের নয়া ঠিকানা নিউটাউন

নগরায়নের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর একই সঙ্গে বাড়ছে এক দ্বিমুখী চাপ। একদিকে বাসস্থানের চাহিদা আর অন্যদিকে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রের কাছাকাছি নতুন বাণিজ্যিক এলাকার খোঁজ। এই দুইয়ের সাঁড়াশি চাপ সামাল দিতেই কলকাতার পূর্ব প্রান্তসীমায় নিউটাউন উপনগরীর পত্তন।

এই উপনগরী প্রতিষ্ঠার সার্বিক দায়িত্বে রয়েছে হিডকো, যা সম্পূর্ণভাবে সরকারি মালিকানাধীন একটি সংস্থা।

অতীতের বাংলায় যা শুধু ভাবনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, আজ তা অতি বাস্তব। আজ তা ডালপালা ছড়িয়ে সুদূরপ্রসারী রূপ ধারণ করেছে। কারণ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে যেভাবে গুরুত্ব সহকারে নিউটাউনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে আর যে দ্রুততায় নিউটাউন স্বপ্নের উপনগরীতে পরিণত হয়েছে তা এককথায় অনবদ্য।

তাই নিউটাউন আজ আমাদের গর্ব। প্রশাসনের মুকুটে সম্মানের নতুন পালক। বিশ্বের দরবারে কলকাতাকে তুলে ধরার নতুন আকর্ষণবিন্দু।

সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী সব মিলিয়ে নিউটাউনে বাস করবেন প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ। পরোক্ষভাবে আরও ৫ লক্ষ মানুষ এখানে যাতায়াত করবেন নানা কাজে। ফলে সস্তা থেকে দামি সব ধরনের আবাসনই তৈরি হচ্ছে দফায় দফায়।

এখন প্রশ্ন, কলকাতা ছেড়ে বসবাসের জন্য কেন একজন মানুষ বেছে নেবেন নিউটাউনকে?

তার কারণ, আধুনিক জীবনযাপনের সবরকম সুবিধাই রয়েছে নিউটাউনে। রয়েছে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো। আধুনিক বাজার, শপিং মল থেকে এডুকেশন, হেলথ এবং আইটি হাব।

সব থেকে বড় কথা, নিউটাউন কলকাতা প্ল্যানিং এরিয়া অর্থাৎ NTPA-কে পরিবেশ বান্ধব শহর হিসাবে গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য ছিল বরাবর। আর এটাই হবে এখানে বসবাসকারী মানুষের কাছে আকর্ষণের প্রধান কারণ। আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—

ক) পূর্ব কলকাতা জলাভূমি এবং বর্জ্য পুনর্নবীকরণ কেন্দ্রের বাইরে উত্তরদিকে নিউটাউনের অবস্থান। পূর্ব কলকাতা জলাভূমি চিরদিনই উন্মুক্ত থাকবে। ফলে গরমের দিনগুলিতে দক্ষিণ দিক থেকে ঠান্ডা, সতেজ বাতাস বয়ে এসে আরামদায়ক করে রাখবে নিউটাউন এলাকাকে।

খ) নিউটাউন প্ল্যানিং এরিয়ার মধ্যে ১৫ শতাংশেরও বেশি জায়গা উন্মুক্ত রাখা হবে। উন্নয়নের কাজ সেখানে কখনওই থাবা বসাতে পারবে না।

গ) নিউটাউনের একদিকে রয়েছে বাগজোলা খাল এবং অন্যদিকে কেষ্টপুর খাল। NTPA- এর উত্তরসীমা বরাবর রয়েছে নোয়াই খাল। জলসেচ ও জলপথ দপ্তর বিস্তর সার্ভের পরে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ নিকাশি প্ল্যান তৈরি করেছে। যার ফলে শুধু নিউটাউন নয়, উপকৃত হবে লোয়ার বাগজোলা বেসিনের বিভিন্ন এলাকাও।

নিউটাউন এলাকার পরিমাপ

শুধু নিউটাউনকে হিসাবের মধ্যে ধরা হলে তা ৭ হাজার একর। আর নিউটাউন সংলগ্ন পরিকল্পিত ডেভলপমেন্ট এরিয়া ধরা হলে আয়তন গিয়ে দাঁড়াবে ২১ হাজার একরের মতো।

২০১১ সালে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত অ্যাকশন এরিয়া তিন অবধি জমি অধিগৃহীত হয়েছিল—সবমিলিয়ে যার মাপ ৭ হাজার একর।

এই অবস্থায় অ্যাকশন এরিয়া চার-এর জন্য আর জমি অধিগ্রহণ না করে জমির ল্যান্ড প্ল্যানিং শুরু করা হয়। ঠিক হয়, এই জমিতে কেউ নির্মাণকাজ করালে তাঁকে আবশ্যিকভাবে কতকগুলি নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। না হলে তাঁর নির্মাণ প্ল্যান অনুমোদন করা হবে না। একইভাবে, নিউটাউন সংলগ্ন ভাঙর, বনতলা ইত্যাদি এলাকার প্রায় ১৪ হাজার একর জমির প্লটভিত্তিক ল্যান্ড প্ল্যানিং করা হয়ে গিয়েছে। এভাবেই নিউটাউনকে কেন্দ্র করে গোটা অঞ্চলকে পরিকল্পিত এলাকা হিসাবে গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য।

স্বপ্নের প্রকৃতিতীর্থ

২০১১-র ১৯ জুলাই। দমদম বিমানবন্দর থেকে ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নিউটাউন সংলগ্ন জলাশয়ের কাছে আসতেই যেন স্বপ্নের ডানা মেলে দিল মান। চোখের সামনে হাজার পাখির কলকাকলি—প্রজাপতির রঙিন হাতছানি—প্রকৃতি যেন রং ঢেলে দিল মনে।

সেই শুরু। ওই জলাশয় ঘিরে ৪৮০ একর জায়গা জুড়ে তৈরি হল পূর্ব ভারতের প্রথম ইকোলজিক্যাল পার্ক। সাধের প্রকৃতিতীর্থ—মানুষ আর প্রকৃতির মিলনভূমি।

২০১২ সালের ৩১ মার্চ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাত্র ৯ মাসের মাথায় অসাধ্য সাধন করে দেখাল হিডকো। ওই একই বছরের ২৮ ডিসেম্বর-এর মধ্যে গোটা দেশের সামনে প্রস্তুত হয়ে গেল দেশের সবথেকে বড়ো পার্ক। উদ্‌বোধনে করা হল ২৯ তারিখ। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে দর্শনার্থীদের কাছে দরজা খুলে দিল নিউটাউনের বুকে একখণ্ড হাইড পার্ক। বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার জায়গা—প্রাণ খুলে প্রকৃতির গন্ধ মেখে নেওয়ার সবুজ হাতছানি।

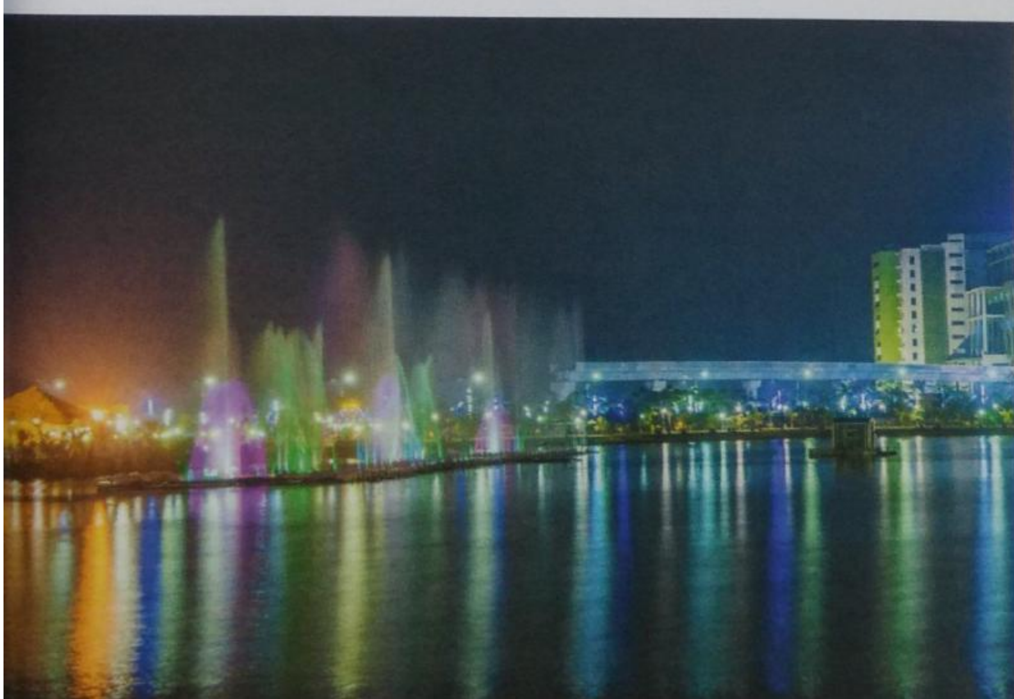

শুরুর দিন থেকেই সুদূরপ্রসারী এই সবুজের মধ্যে হারিয়ে যেতে ভালোবাসেন কলকাতাবাসী। গত পাঁচ বছরে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ পার্কে এসেছেন। শুধু ২০১৮-র প্রথম দিনই হাজির ছিলেন ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৮৫ জন। অভাবনীয়! আর দৈনিক গড় হাজিরা ৮২১৮।

কী আছে এই ইকো পার্কে? না, প্রশ্নটা হবে—কী নেই ইকো পার্কে? গোলাপ বাগ, বাঁশ বাগান, ভেষজ উদ্যান, প্রজাপতি উদ্যান। আছে বিশ্ববাংলা হাট, মুখোশ উদ্যান—জাপানি অরণ্যও।

সন্ধ্যার আলোয় মায়াবী ইকোপার্ক।

প্রকৃতির মাঝে এক দ্বীপ

সবুজসাথী এর নাম। কারণ, সত্যিই এই দ্বীপ প্রকৃতিকে মানুষের কাছে এনে দেয় এক নিমেষে। শহুরে মনটা শান্ত হয়ে যায়। ৭ একর দ্বীপের চারদিকে শুধু জল আর জল। ১১২ একরের একটি সুবিশাল হ্রদ। শিকারায় চড়তে পারেন—আছে পনটুন রাইড, ওয়াটার সাইক্লিং, কায়াকিং—আরও অনেক কিছু। সেরে নিতে পারেন খাওয়া-দাওয়া। রিল্যাক্স করার আদর্শ জায়গা বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। শুধু তাই নয়, প্রকৃতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে এর।

বছরে ১৮০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয় নিউটাউনে। ৭০ শতাংশ বাষ্পীভূত হয়ে যাওয়ার পরেও যে জল অবশিষ্ট থাকে, তা ওই হ্রদে জমা হয়। আর গোটা পার্কে প্রত্যহ জল দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় তা। অন্যদিকে মাটিতে জলের ভারসাম্য রক্ষা করতেও ওই হ্রদের জলের ভূমিকা রয়েছে। এতদিন শুধু বোটের মাধ্যমে ওই দ্বীপে যাওয়া যেত। তবে, এখন মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে দীর্ঘ কাঠের একটি সেতুর মাধ্যমে।

এই দ্বীপে রয়েছে ২৮০০ স্কোয়ার ফুট মাপের একটি কাচবাড়ি। নাম উৎসারি। এই কাচবাড়িতে বসেই দেখা যায় গোটা দ্বীপটিকে।

প্রকৃতির এই নীরবতার মাঝে সময় কাটাতে চান? ধরা দিতে চান এই সবুজের হাতছানিতে? ২৪ ঘণ্টা রুম সার্ভিসের সুবিধা-সহ ২২টি দ্বিশয্যার কটেজ আপনাকে দু-হাত বাড়িয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

মাছ ধরার শখ পূরণ করতে তৈরি করা হয়েছে ৫টি জেটি। আগে থেকে বুক করে নিজের জায়গা পাকা করে রাখুন। আর তারপর শুধু সময়ের অপেক্ষা। নিজের ধরা মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরুন আনন্দে।

সংগ্রহ

দুর্গাপুজোয় কলকাতার প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে আজ শিল্পসৃষ্টির ছড়াছড়ি। শহর তখন দিগন্তজোড়া এক আর্টগ্যালারি যেন।

সেই অনবদ্য শিল্পসৃষ্টির কয়েকটিকে আজীবন ধরে রাখার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার নাম 'সংগ্রহ'।

খাওয়া দাওয়া/কেনাকাটা

কাঁথার কাজের শাড়িই হোক বা পটচিত্র—বাংলার নিজস্ব হস্তশিল্প সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে বিশ্ববাংলা হাট। এছাড়া কিনে নেওয়া যেতে পারে তাজা ফল আর সবজি।

দর্শনার্থীদের রসনাতৃপ্তির জন্যও রয়েছে ঢালাও বন্দোবস্ত। জাপানি খাবারের জন্য—ফুজি। পাবেন তেরিয়াকি চিকেন, জিভে জল আনা মাকি। সঙ্গে অনবদ্য জাপানি সাজসজ্জা। রয়েছে কাফে একান্তে। একটি আসাধারণ হাউসবোট, নৌকায় রেস্তোরাঁ আর একটি সাজানো বাগান। সূর্যের আলো, আর জলের আওয়াজের মধ্যে আপনার পছন্দমতো যেখানে খুশি বসে সারুন খাওয়া দাওয়া।

প্রকৃতি তীর্থের মধ্যেই তৈরি হয়েছে কলকাতায় বিরল হয়ে যাওয়া গাছ-গাছালির 'রবি-অরণ্য'। ছাতিম, অমলতাস, মহুয়া, কুর্চি, কনকচাঁপা, পারুল—এসব গাছে সেজে উঠেছে এই বনানী। প্রকৃতি তীর্থ ছাড়াও নিউটাউনের সর্বত্রই রয়েছে প্রকৃতিকে আঁকড়ে বেঁচে থাকার প্রয়াস।

শুধু তাই নয়, কলকাতায় আসা আন্তর্জাতিক মানের ব্যক্তিত্বদের কলকাতা সফরের স্মৃতি ধরে রাখতে তৈরি করা হয়েছে স্মৃতি বন। বিদেশি অতিথিদের কাছে আবেদন রাখা হচ্ছে—তাঁরা যেন ওই বনে একটি গাছের চারা পুঁতে দিয়ে যান। গাছ বড়ো হওয়ার পাশাপাশি গাছের ফলকে রাখা থাকবে তাঁদের স্মৃতি। নিউটাউন প্লাজা থেকে উত্তর-পূর্ব কোণে পাঁচ একর জায়গায় তৈরি হয়েছে স্মৃতিবন।

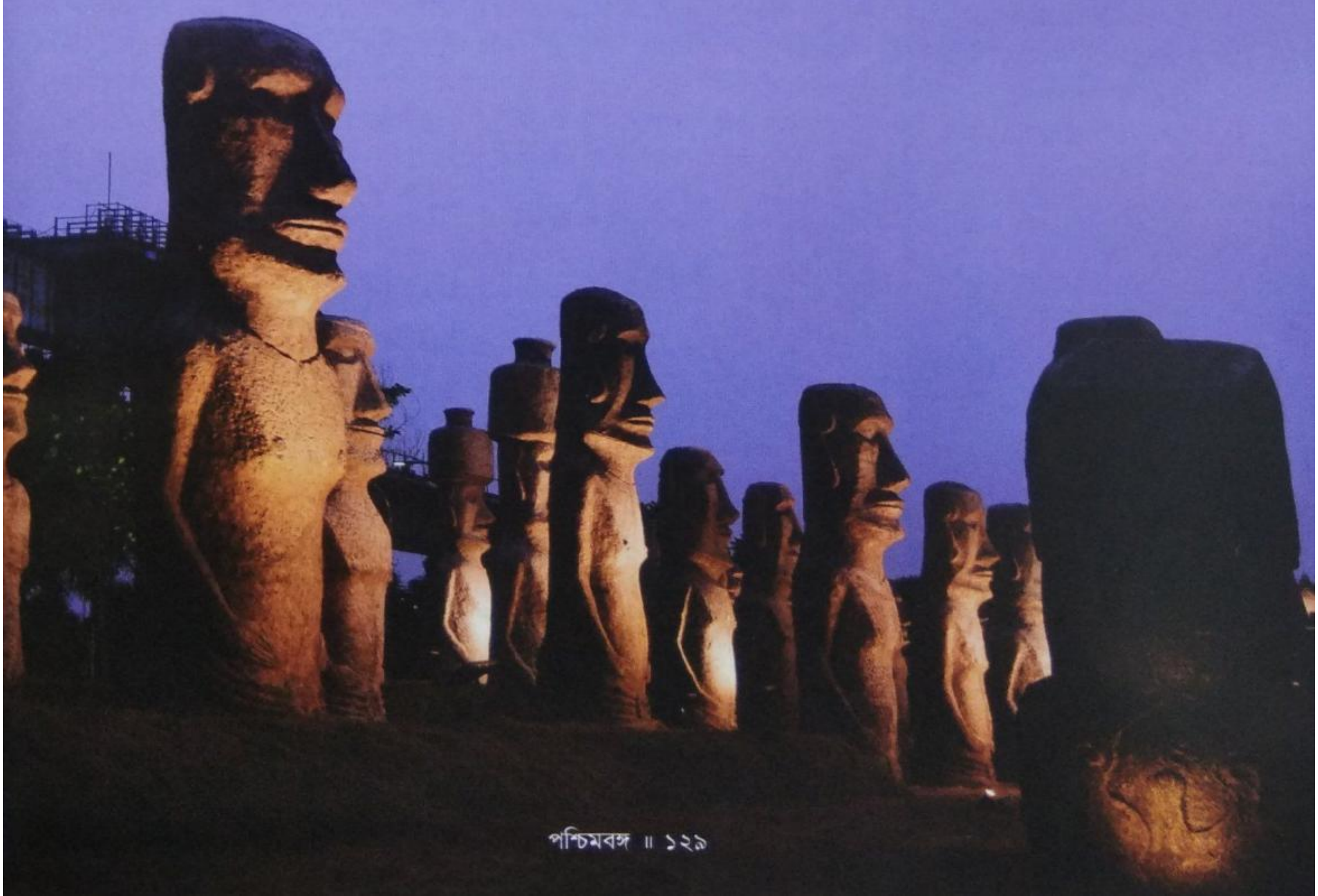

ইকো ভিলেজ

নিউটাউনে ইকো পার্কের উল্টোদিকে ৪৮ একর জমির উপর একেবারে বাস্তু মেনে তৈরি করা হয়েছে আরবান ইকো ভিলেজ অর্থাৎ শহুরে গ্রাম। শহরের বুকে আদর্শ গ্রামের অনুভূতি—থাকছে মাটির ঘর, পুকুর, নৌকা। চেখে দেখা যাবে গ্রামবাংলার খাবার। ঝিলের জলে হাঁস চরবে, পাড়ে থাকবে বিভিন্ন ফুল ও ফলের গাছ। দুপুরে একটু জিরিয়ে নিতে চান? কুঁড়েঘর থাকছে সেজন্য। কোথাও শান্তিনিকেতন, কোথাও দার্জিলিঙের গ্রামের অনুভূতি মিলবে—উত্তর ভারত বা দক্ষিণ ভারতের কোনও গ্রামের অনুভূতিও পেতে পারেন। ইকো পার্কের ২ ও ৩ নম্বর গেটের মাঝামাঝি বিশ্ববাংলা সরণি থেকে একটি চওড়া রাস্তা চলে গিয়েছে অ্যাকশন এরিয়া-২-এর একেবারে শেষপ্রান্তে। এখানে রয়েছে হাইল্যান্ড উইলোস, মল্লিকা, মালঞ্চ ইত্যাদি আবাসন। এর বিপরীতে নবাবপুর ও ফমেরহাটি গ্রামের পাশে রয়েছে সুবিশাল জায়গা। সেখানে পানিফল হয়। হয় মাছচাষ। গ্রামের মানুষ ছাড়া আবাসনের বাসিন্দারাও মাছ ধরেন সেখানে। এই জলাশয়ের চারপাশেই তৈরি হয়েছে আরবান ইকো ভিলেজ। ৮০ একর জলাশয়ে মাছ ধরা, বোটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০ টাকার টিকিট কেটেই শহরের মাঝে গ্রামজীবনকে ছুঁয়ে যেতে পারেন কলকাতাবাসী।

পানীয় জল

হাজার হাজার নিউটাউনবাসীর আশা পূরণ করে ইতিমধ্যেই ৭২৬ কোটি টাকার পানীয় জল পরিশ্রুতকারী প্রকল্প চালু করেছে সরকার। হিডকোর অর্থানুকূল্যে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এই কাজে উপকৃত হবেন প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ। প্রতিদিন সরবরাহ করা হবে ২০ মিলিয়ন গ্যালন পরিশ্রুত জল। গঙ্গার জল তোলা হবে দেবেন্দ্রবালা ঘাটের কাছে। এরপর সেই জল ১০ কিলোমিটার দূরে ট্রিটমেন্ট-এর জন্য পাঠানো হচ্ছে। নিউটাউনের বাসিন্দাদের ঘরে ঘরে পরিস্রুত পানীয় জল পাঠাতে পারা যেন একটি মাইলস্টোন পেরোনোর শামিল।

রবীন্দ্রতীর্থ

পাঁচ একর জমির উপর গড়ে উঠেছে রবীন্দ্র সংস্কৃতিচর্চার এক আন্তর্জাতিক মানের পীঠস্থান। রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা আমাদের মননে, তাঁর আদর্শ আমাদের চিন্তার খোরাক। তাই তাঁর শহর কলকাতায় তাঁর জীবন ও

কর্ম নিয়ে চর্চার কেন্দ্র থাকবে না—তাও কি হয়? এই অভাব দীর্ঘদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরে মানুষের দীর্ঘকালের অপূর্ণ এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ শুরু করে হিডকো। রেকর্ড সময়ে শেষ হয় প্রায় ২৭ কোটি টাকার এই প্রকল্প।

কী আছে রবীন্দ্রতীর্থে

সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রবীন্দ্রতীর্থ রবীন্দ্র গবেষণার এক নতুন প্রাণকেন্দ্র। প্রযুক্তির পাশাপাশি শৈল্পিক স্থাপত্যের মিশেল অনন্যসাধারণ করে তুলেছে এই কেন্দ্রকে। শুধু এ রাজ্য নয়, ভিনরাজ্যের মানুষ, এমনকি বিদেশের রবীন্দ্র গবেষকেরাও এখানে গবেষণার সুযোগ পাবেন। সাধারণ রবীন্দ্রানুরাগী মানুষজন এখানে এসে কবিকে জানার সুযোগ পাবেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম এবং তাঁর উপরে হওয়া যাবতীয় গবেষণা যাতে সহজবোধ্যভাবে গবেষক ও সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা যায়—এমনটাই ভাবনা ছিল রাজ্য সরকারের। তাই এই বিস্তৃত আয়োজন।

সেমিনার, নাটক, রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের জন্য রয়েছে ২০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, রবীন্দ্রসংগীতের সমস্ত সংকলন ধরে রাখা হয়েছে 'মিউজিক স্টোর'-এ। আছে ৫০ আসনের সিনেমা হল। রবীন্দ্র সাহিত্য যা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে—সেগুলির সঙ্গে বিভিন্ন তথ্যচিত্র দেখারও সুযোগ পাবেন দর্শকেরা।

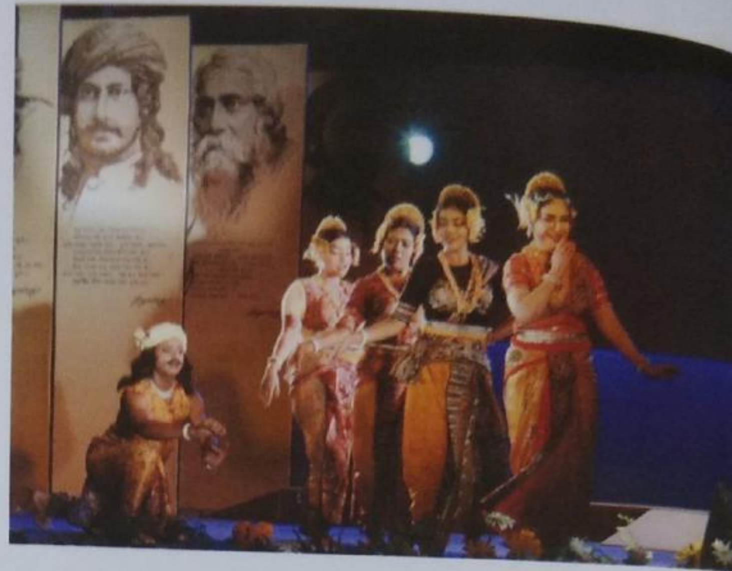

প্রায় ৯ হাজার স্কোয়ার ফিটের উপর প্রশস্ত প্রদর্শনী হলে 'মেজর ওয়ার্কস অব টেগোর' নামে একটি বিভাগ থাকছে—সেখানে ঠাঁই পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি। বর্তমান প্রজন্মকে রবীন্দ্রসৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত করাতে তৈরি হয়েছে ডিজিটাল আর্কাইভ। রবীন্দ্রতীর্থের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই আর্কাইভটি মানুষের ধরাছোঁয়ার মাধ্যে এসেছে। কবির সমস্ত সাহিত্যকর্ম, আঁকা ছবি ছাড়াও এখানে ঠাঁই পেয়েছে তাঁর গান, কবিতা এবং ছোটোদের বিভাগে 'ছড়ার ছবি' আর 'খাপছাড়া'। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িত মানুষজনের পরিচয় ও ছবি রাখা হয়েছে 'বায়োগ্রাফি' অংশে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সাল অনুযায়ী তুলে আনা হয়েছে 'রবিসরণি' অংশে।

এই রবীন্দ্রতীর্থ—যাতে মানুষের প্রাণের আরাম হয়, তার যথাযথ যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে গুরুত্ব পেয়েছে এখানকার দৃষ্টিনান্দনিকতার দিকটিও। এই কেন্দ্রের মধ্যপ্রান্তে রয়েছে কৃত্রিম এক জলাশয়। রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ ব্রোঞ্জমূর্তি অধিষ্ঠিত সেখানে।

গবেষণার কাজে যাঁরা বাইরে থেকে আসবেন রয়েছে তাঁদের জন্য থাকার ব্যবস্থা। দেশবিদেশের ৮০ জন গবেষক একই সময়ে যাতে এখানে থাকতে পারেন তার জন্য তৈরি হয়েছে ছোটো ছোটো কটেজ। ফাঁকা জায়গায় সবুজের ছড়াছড়ি।

রবীন্দ্রচেতনা এ রাজ্যের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হোক—আরও বেশি করে। তাঁকে জানার, বোঝার সুযোগ পান মানুষ—শুধু এটুকুই আকাঙ্ক্ষা। আর তাই এই কর্মযজ্ঞ।

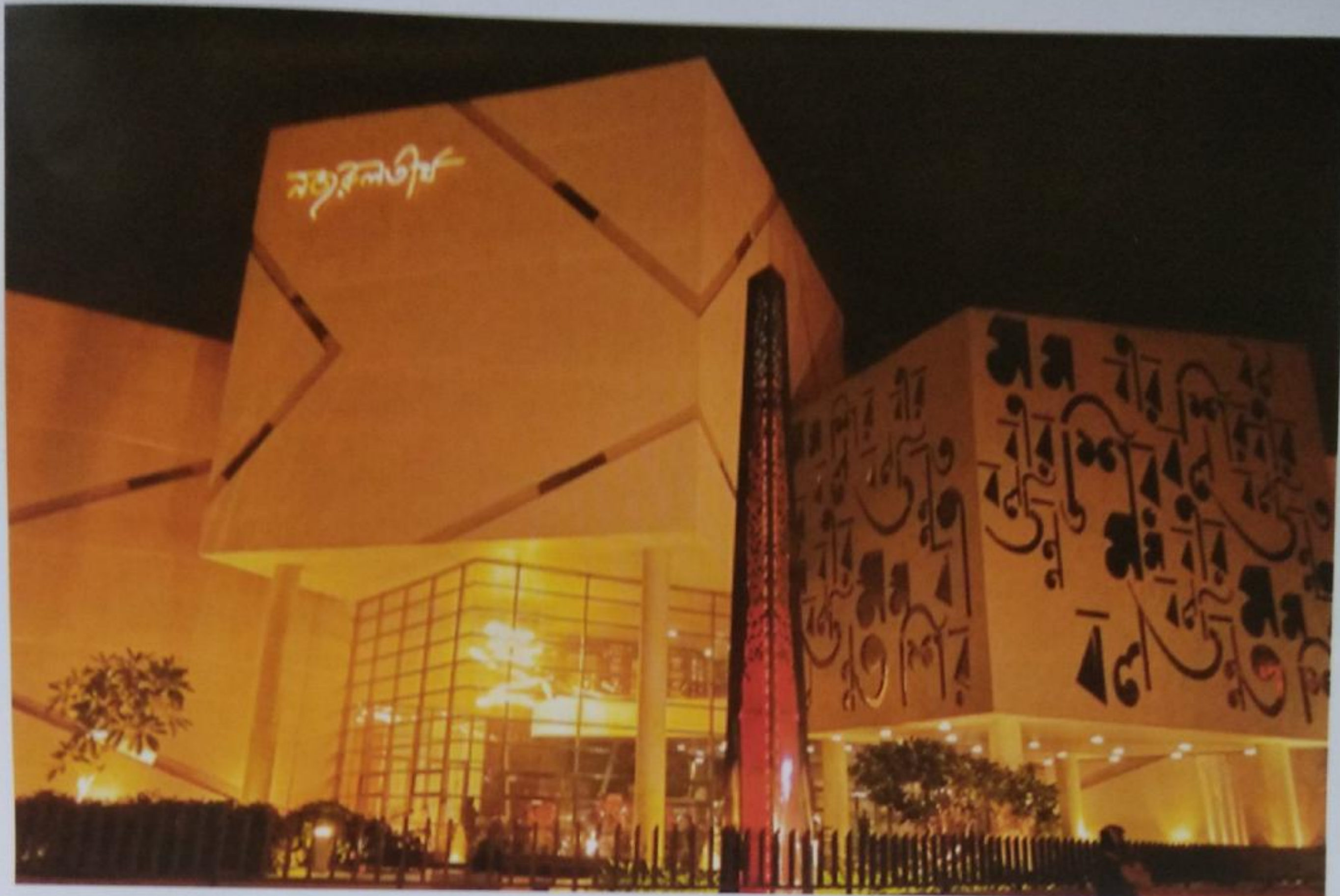

নজরুলতীর্থ

এবারে আসা যাক নজরুলতীর্থ-এর প্রসঙ্গে। নজরুলতীর্থ অচিরেই নিউটাউনের 'নন্দন' হয়ে উঠবে— এমনটাই আশা রাজ্য সরকারের। আর সেই অভীষ্টে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে নজরুলতীর্থ।

নজরুলতীর্থে দুটি স্ক্রিনে বিভিন্ন সিনেমা দেখা যায়। এমনকি, BOOK MY SHOW-এর মাধ্যমে সমস্ত সিনেমার টিকিটও বুক করা সম্ভব। রয়েছে চারটি সুবিশাল র‍্যাম্পবিশিষ্ট একটি ওপেন-এয়ার-থিয়েটার। স্বল্প ভাড়ায় যেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা যায়। বিভিন্ন স্কুল-কলেজে এই মুক্তাঙ্গনটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয়তলে রয়েছে দু'টি আর্ট গ্যালারি। বিভিন্ন কাজের সূত্রে আসা অতিথিদের থাকার ব্যবস্থাও করা হয়েছে খোদ নজরুল তীর্থেই। স্বল্প ভাড়ায় পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম, বাতানুকূল এই ঘরগুলিতে থাকতে খুবই পছন্দ করেন তাঁরা। যাঁর নামে এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে, সেই বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের জীবন ও কাজ নিয়ে তৈরি হয়েছে অনবদ্য একটি মিউজিয়াম। এখানে জায়গা করে নিয়েছে তাঁর জীবনের বহু দুষ্প্রাপ্য ছবি, ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিস, গুরুত্বপূর্ণ নথি ইত্যাদি। মাত্র ১০ টাকার টিকিট কেটে যে কেউ নজরুল ইসলামের কর্ম ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারেন। এছাড়া নজরুলতীর্থের নিজস্ব ওয়েবসাইটেও রয়েছে সাল-তারিখ-সহ কবির জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বিস্তৃত বিবরণী।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে এই নজরুলতীর্থে। কবির জীবন ও সংস্কৃতি সাধনার নানা মুহূর্ত সংরক্ষণ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তৈরি হয়েছে ডিজটাল আর্কাইভ বা মহাফেজখানা। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্ব বাঙালির কাছে পৌঁছে যাবেন নজরুল—এ তো আমাদের স্বপ্ন। নজরুলতীর্থের তিনতলায় একদিকে থাকছে নজরুল সম্পর্কিত বই নিয়ে গ্রন্থাগার আর অন্য অংশে ডিজিটাল আর্কাইভ। দেশবিদেশের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকেরা এখানে তাঁর সম্পর্কে গবেষণা করতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

মাদারস ওয়্যাক্স মিউজিয়াম

এই মিউজিয়াম নিউটাউনের আরও একটি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। লন্ডন-বার্লিন নয়, খোদ কলকাতার বুকে করা হয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চেহারা মোমের মূর্তিতে ধরে রাখার প্রয়াস। শুধু মূর্তি সাজানো নয়, আনুষঙ্গিক একটি আবহ তৈরির প্রচেষ্টা দর্শকদের কাছে বিশেষ প্রশংসা পাচ্ছে। যেন একটা জীবন্ত পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে এক-একটি মূর্তিকে ঘিরে। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, গান্ধিজি থেকে শচিন, সৌরভ, অমিতাভ বচ্চন কে নেই এখানে?

বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টার

উচ্চতা প্রায় ৯৫ ফুট। গড়ে উঠেছে ১০ একর জায়গার উপর। এই কনভেনশন সেন্টার বিশ্বের দরবারে বাংলার শিল্পায়নে নতুন এক মুকুট যোগ করেছে—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বাংলায় সূচিত হয়েছে নতুন এক অধ্যায়। ফ্লোরিডা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দুবাই-এর কনভেনশন সেন্টারের সঙ্গে এখন একযোগে আমাদের নামও উচ্চারিত হচ্ছে। পৃথিবীর উচ্চতম ৩২০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, ৪টি ব্যাঙ্কোয়েট হল, ৬টি প্রদর্শনী স্থল, ১০০ ঘরের একটি পাঁচতারা হোটেল, দুটি মিনি অডিটোরিয়াম, ১০টি মিটিং রুম, সুইমিংপুল, লাইব্রেরি কী নেই এখানে? তাইতো ২০১৮ সালের বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট রমরমিয়ে উদ্‌যাপিত হয়ে গেল এখানে।

২০১৮ বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করছেন মুখ্যমন্ত্রী

শুধু নান্দনিকতা আর সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরিই নয়—নিউটাউনে গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক ফিনান্সিয়াল হাব। কাছেই বিমানবন্দর। ঝকঝকে চওড়া রাস্তা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-সহ সমস্ত অত্যাধুনিক পরিষেবা মেলায় এই অর্থতালুক আমাদের রাজ্যে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য এক নতুন হাতিয়ার। ২৫ একর জমিতে এই হাব তৈরির পাশাপাশি ৩০০ একর জমিতে তৈরি হচ্ছে সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট। আগামি দিনে এই আর্থতালুক আরও সুদূরপ্রসারী ডানা মেলবে এমনটাই আশা রাজ্য সরকারের। ইতিমধ্যেই ব্যাংক, বিমানসংস্থা, মিউচুয়াল ফান্ড, অফসোর ব্যাংকিং বিনিয়োগ, ঋণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই হাব পূর্ব ভারতে লগ্নির অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

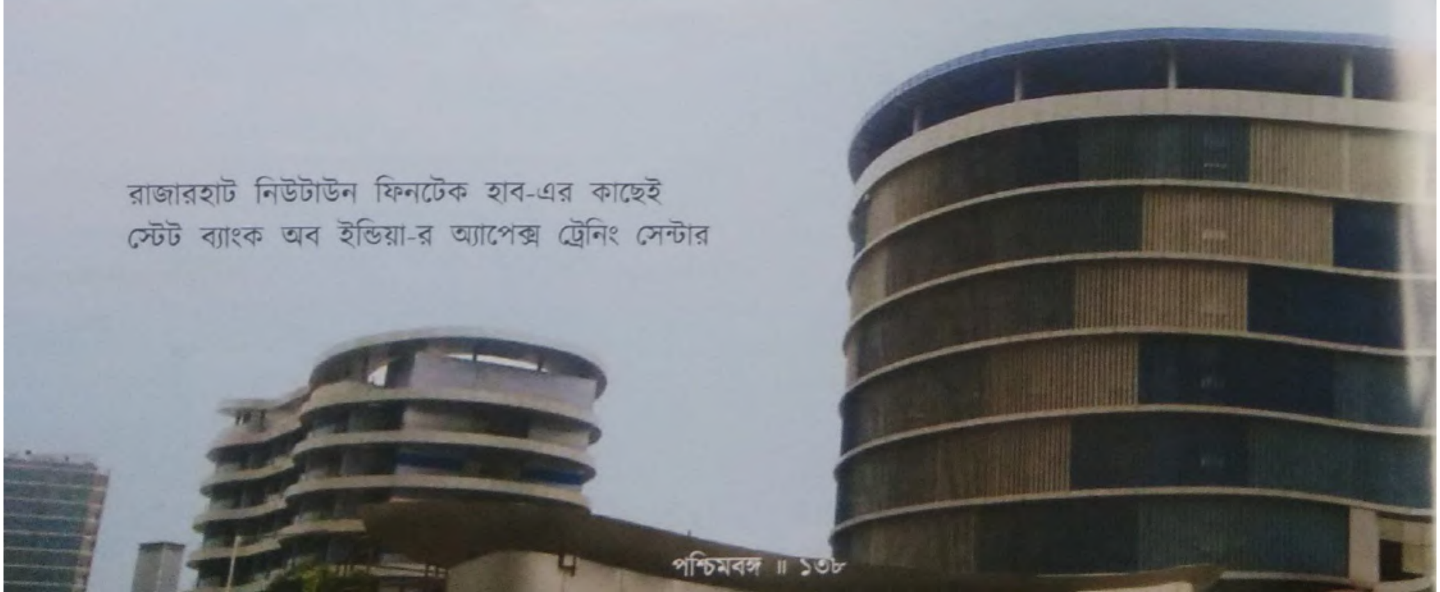

রাজারহাট নিউটাউন ফিনটেক হাব-এর কাছেই
স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া-র অ্যাপেক্স ট্রেনিং সেন্টার

অন্যান্য

নিউটাউন-রাজারহাট চত্বরে রোজ কত নতুন নতুন কাজ হচ্ছে। প্রেসিডেন্সি, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় আগেই জমি নিয়েছে। সম্প্রতি জমি পেয়েছে কলকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া ক্যাম্পাস গড়বে টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও।

ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরির জন্য অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে ১৫ একর জমি দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে।

অ্যাকশন এরিয়া ২-ডি তে হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট মাঠ। দোতলা গ্যালারি, এলইডি ডিজিটাল স্কোর বোর্ড—মাঠকে আকর্ষণীয় চেহারা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই তৈরি ফুটবল গ্রাউন্ড, শিশুদের খেলার জন্য বহু পার্ক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, নিউটাউনের নানা জায়গায় আধুনিক বাস-শেড। হয়েছে ট্রাফিক সিগন্যালিং এবং বাড়ির আবর্জনা ভূগর্ভস্থ পাইপ-লাইনের মাধ্যমে সংগ্রহ করে সাফ করার আধুনিক ব্যবস্থা।

মনোরেল

মুম্বাই ও চেন্নাইয়ের পর ভারতের তৃতীয় শহর হিসাবে মনোরেল উপহার পেতে চলেছে কলকাতা। হিডকোর উদ্যোগে মনোরেল চলবে উল্টোডাঙা থেকে নিউটাউন পর্যন্ত।

অন্যদিকে, গড়িয়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রেরেলের অনেকটাই যাচ্ছে নিউটাউনের ভিতর দিয়ে। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোও পথচলা শুরু করবে নিউটাউনের দোরগোড়া দিয়ে। সেইসময় বদলে যাওয়া শহরের আকাশরেখায় নতুন ছবি এঁকে দেবে মনোরেল।

বাস

নিউটাউনে বর্তমানে প্রায় ১০০টি রুটে বাস চলাচল করে। এছাড়াও পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে কয়েকটি ব্যাটারিচালিত বাস।

সাইকেল

মানুষের সুবিধায় চালু হয়েছে কম খরচে মোবাইল-অ্যাপ-নির্ভর সাইকেল পরিষেবাও। নিউটাউন কলকাতা ডেভলপমেন্ট অথরিটি-র সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধেছে গাড়ি ভাড়া দেওয়ার একটি নামকরা সংস্থা। কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ না ফেলেই কম খরচে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া এখন নিউটাউনবাসীর কাছে নেহাতই মামুলি বিষয়।

বৃদ্ধাবাস

প্রবীণ প্রবীণাদের বৃদ্ধকালের আবাসস্থল হিসাবে গড়ে উঠতে চলেছে স্নেহদিয়া। ৯০টি এক শয্যাবিশিষ্ট এবং ৫৭টি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ঘর থাকবে এগারোতলা এই বাড়িতে।

বয়স্কদের উদ্যান স্বপ্নভোর-এর কাছেই গড়ে উঠছে বড়োসড়ো এই আবাসন প্রকল্প। প্রবীণদের অবসর ও অবশিষ্ট জীবনকে মসৃণ ও সুন্দর করে তুলতেই স্নেহাদিয়া-র ভাবনা হিডকোর।

ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম, ছোট্ট রান্নাঘর, বসার জায়গা, আর বারান্দা। প্রতিটি ঘর হবে বাতানুকূল। একেবারে উপরের দুটিতলা প্রিমিয়াম। সেই ১০ ও ১১ তলায় যাঁরা থাকবেন তাঁরা চাইলে ঘরের সামনেই সবুজ ঘাসের সাজানো বাগানে সকাল সন্ধ্যা হাঁটতে পারবেন। চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা।

প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ছবিগুলি হিডকো সূত্রে প্রাপ্ত

এছাড়া তৈরি হয়েছে বহু হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি। নিউটাউন ঘিরে সরকারের নিত্যনতুন কর্মকাণ্ডের তালিকা শেষ হওয়ার নয়। আগামী বছরগুলিতে সরকার এই নতুন উপনগরীর জন্য আরও বহু সুখবর নিয়ে আসতে চলেছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

কৃতী-স্বীকৃতি-সম্মাননা

পশ্চিমবঙ্গবাসী তথা বাঙালি হিসেবে আমরা আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গর্বিত। আর এই গর্বকে চিরতরে লোকমানসে জাগরূক রাখতে গেলে সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন প্রবীণদের সম্মাননা প্রদান এবং নবীনদের উৎসাহিত করা। নতুন রাজ্য সরকার ক্ষমতায় এসে বঙ্গসংস্কৃতির দীর্ঘদিনের ধারক ও বাহকদের জনসমক্ষে তুলে এনে স্বীকৃতি দিয়ে একটা সামাজিক বার্তা দিতে চেয়েছে। যার অদ্যন্ত ভাবনায় অত্যন্ত সুচারুভাবে সমাজের নানা স্তরের নানা পেশার মানুষদের সম্বর্ধনা প্রদানের ধারাবাহিক ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। প্রতি বছর প্রতিটি অনুষ্ঠানে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে প্রত্যেক বঙ্গগুণীজনকে নিজ হাতে সম্বর্ধিত করেন—নিজে তাঁর হাতে সম্মাননা তুলে দেন। আসলে বাংলায় শিল্প-শিক্ষা-সাহিত্য-সংগীত-চিকিৎসা-সমাজসেবা-সংস্কৃতির একটা নিজস্ব ধারা বহমান। সময়ের সঙ্গে পালটে যায় সেই ধারা। হাল ধরে নব প্রজন্ম। কিছু স্রষ্টা হারিয়ে যায় স্মৃতির অতল গভীরে-ভুলে যায় পরবর্তী প্রজন্ম। কিন্তু নবীন-প্রবীণের মেলবন্ধন ঘটাতে হলে সবচেয়ে ভাল পথ সম্মাননা প্রদান। যোগ্য ব্যক্তিদের সম্মান জানিয়ে এক নতুন দিকের সূচনা করেছে নতুন, রাজ্য সরকার।

বঙ্গবিভূষণ ও বঙ্গভূষণ

রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান বঙ্গভূষণ ও বঙ্গবিভূষণ প্রদানের সূচনা হয়েছিল ২০১২ সালের ২০মে, প্রগতি উৎসবে, নতুন সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে। সে বছর বঙ্গবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত হন-লেসলি ক্লডিয়াস, সুচিত্রা সেন, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, যোগেন চৌধুরী, গৌতম ঘোষ, বিভাস চক্রবর্তী, রঞ্জিত মল্লিক, উস্তাদ আলি আহমেদ হোসেন খাঁ, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, শাঁওলী মিত্র, জয় গোস্বামী। বঙ্গভূষণ সম্মানে ভূষিত হন রশিদ খান, বিক্রম ঘোষ এবং নচিকেতা।

আদিবাসীদের সম্মাননা

যাঁরা পিছনে পড়ে আছে, তাঁদের এগিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর পশ্চিমবঙ্গের নতুন মা-মাটি-মানুষের সরকার। আদিবাসীদের কল্যাণ তাই শুধু একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীগুলির জন্য নানা ধরনের উন্নয়ন পর্ষদ গঠন থেকে শুরু করে সমাজের পাদপ্রদীপের আলোয় তাঁদের তুলে এনে পুরস্কার প্রদান—সবটাই হয়েছে নতুন সরকারের আমলে। ২০১৪-র ডিসেম্বরে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আদিবাসী কৃতীদের সম্মানিত করে সেই ভাবনার সূচনা করলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী।

সাঁওতালি সাহিত্যে গবেষণা ও পত্রিকা সম্পাদনার জন্য কলেন্দ্রনাথ মাণ্ডি, টোটো সম্প্রদায়ের তরুণ কবি ও সাহিত্যিক সত্যজিৎ টোটো, নৃত্যকলায় অসামান্য অবদানের জন্য দ্বারেন্দ্র ঈশ্বরানী, সাঁওতালি সাহিত্যে

তরুণ কবি ও সাহিত্যিক সত্যেশ্বর মুর্মু, বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক রূপচাঁদ হেমরম, সাঁওতালি সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য সারিধরম হাঁসদা প্রমুখকে এদিন সম্মানিত করা হয়।

নজরুল পুরস্কার

নজরুলের জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণা, নজরুল সৃষ্টি সম্ভারের যথাযথ সংরক্ষণ, নজরুলসংগীতের প্রচার ও প্রসার, নজরুলের মানবতাবোধ প্রচার ইত্যাদি বিষয়ে অবদানের জন্য ২০১২ সালের ২৫ মে, মুখ্যমন্ত্রী ড. অনুপ ঘোষালকে নজরুল-স্মৃতি পুরস্কার এবং ফিরোজা বেগমকে বিশেষ নজরুল পুরস্কারে সম্মানিত করেন। প্রতি বছরই এভাবে নজরুলস্মৃতির ধারক ও বাহকদের সম্মানিত করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

চলচ্চিত্র পুরস্কার

২৪ জুলাই। মহানায়কের প্রয়াণ দিবস। প্রতি বছর মুখ্যমন্ত্রী সম্মানিত করে চলেছেন বাংলা তথা ভারতের চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের। ২০১৩ সালে প্রথম চলচ্চিত্র পুরস্কারে সম্মানিত হলেন মাধবী মুখার্জি, সন্ধ্যা রায়, দীপঙ্কর দে, রঞ্জিত মল্লিক ও গৌতম ঘোষ। মহানায়ক সম্মান পেলেন তাপস পাল ও প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি। এছাড়া অভিনয়, সম্পাদনা, শিল্প নির্দেশনা, শব্দগ্রহণ, চিত্রগ্রহণ, রূপসজ্জা, প্রযোজনা এবং সুর-সহ নানা বিভাগে প্রাক্তন ও বর্তমান কলাকুশলীদের সম্মানিত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এতদিন যাঁরা পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে পারেননি, তাঁদের সভামঞ্চে তুলে এনে মুখ্যমন্ত্রীর স্বীকৃতি—এ এক অন্য দৃষ্টান্ত।

মহাসংগীত ও সংগীত সম্মান

সম্পূর্ণ এক অন্য আবহে প্রতিবছর সংগীত মহাসম্মান এবং সংগীত সম্মানে কৃতীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্মাননা প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। যেন ফিরে ফিরে আসে সুর ঝরনার সেই দিনগুলি। বিভিন্ন বছরে প্রভাতী মুখোপাধ্যায় থেকে তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, অরুণ ভাদুড়ি, মণিলাল নাগ, অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বুধাদিত্য মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্টদের সংগীত মহাসম্মানে সম্মানিত করা হয়। অন্যদিকে বাংলার বহু প্রান্তিক এলাকায় আজও নানা লোকশিল্পী লোকসংগীতের সুর বেঁধে গান গেয়ে চলেছেন। যেমন—ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, লেপচা, বাউল, ছৌ, কীর্তন, পটের গান প্রভৃতি। প্রতিবছরই সংগীত সম্মানে এইসব জগতের বিশিষ্ট শিল্পীদের সম্মানিত করা হয়।

বাংলার মানুষের পক্ষ থেকে মহান শিল্পী মান্না দে-কে শ্রদ্ধা জানাতে বেঙ্গালুরুতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে 'বিশেষ সংগীত মহাসম্মান'-এ সম্মানিত করে আসেন মুখ্যমন্ত্রী।

শিক্ষারত্ন

'আপনারাই মানবসম্পদ গড়ার কারিগর। আপনাদের সম্মান জানানো আমাদের কাজ। আপনারা যাঁরা মানবিকতার পাঠ শেখান, তাঁদের প্রতি মানবিক হওয়া আমাদের কর্তব্য। আপনারাই জীবনে মানবতার প্রথম পাঠ শেখান। ভবিষ্যতে আমরা যে পেশাতেই যাই না কেন, ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে শিক্ষকদের দিক নির্দেশে। তাই রাজ্য সরকার শিক্ষকদেরও সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। '২০১২ সালে, নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে, নতুন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শিক্ষক দিবস পালনের অভিনব আয়োজনের অনুষ্ঠানে এই বক্তব্য রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই থেকে প্রতিবছর এই দিন রাজ্যের ১০০ জন কৃতী শিক্ষককে শিক্ষাদপ্তরের পক্ষ থেকে 'শিক্ষারত্ন' সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

টেলি আকাদেমি পুরস্কার

চলচ্চিত্র জগতের পাশাপাশি বাংলার টেলিজগৎ অর্থাৎ সিরিয়ালের কলাকুশলীদেরও সংবর্ধনা দেওয়া শুরু করেছে এই সরকার। সন্ধে হলেই বিভিন্ন চ্যানেলের বেশ কিছু সিরিয়াল যেমন—ইচ্ছে নদী, বধূবরণ, সাধক বামাক্ষ্যাপা, বোঝে না সে বোঝে না, কিরণমালা, তুমি রবে নীরবে, দীপ জ্বেলে যাই, গোয়েন্দা গিন্নি, তুমি আসবে বলে, জলনূপুর ইত্যাদির সামনে বসে পড়েন গ্রাম-শহরের হাজার হাজার মানুষ। তাই প্রয়োজন এঁদের শিল্পীদের স্বীকৃতি—যা টেলি আকাদেমি পুরস্কারের মাধ্যমে প্রতিবছর মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

খেলরত্ন

মনোতোষ রায়, শচীন নাগ, গোরাচাঁদ শীল থেকে সৌরভ গাঙ্গুলি, পিকে ব্যানার্জি, সোমা বিশ্বাস, ঝুলন গোস্বামী, চুণী গোস্বামী, সূর্যশেখর গাঙ্গুলি, গৌতম সরকার। এঁদের মতো বহু জীবিত বা প্রয়াত কিংবদন্তী ক্রীড়াবিদ রয়েছেন, যাঁরা বাংলার গর্ব। নতুন রাজ্য সরকার ক্ষমতায় এসেই এইসব অগ্রণী খেলোয়াড়দের সম্মাননা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফুটবল থেকে তিরন্দাজি, হকি থেকে ওয়াটারপোলো, ডারোডোলন থেকে বক্সিং—সর্বত্রই ভারতের তথা বিশ্বের ইতিহাসে এঁদের কুর্নিশ করা হয়। প্রতিবছর এঁদের খেলারত্ন কিংবা দ্রোণাচার্য সম্মানে সম্মানিত করতে পেরে আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

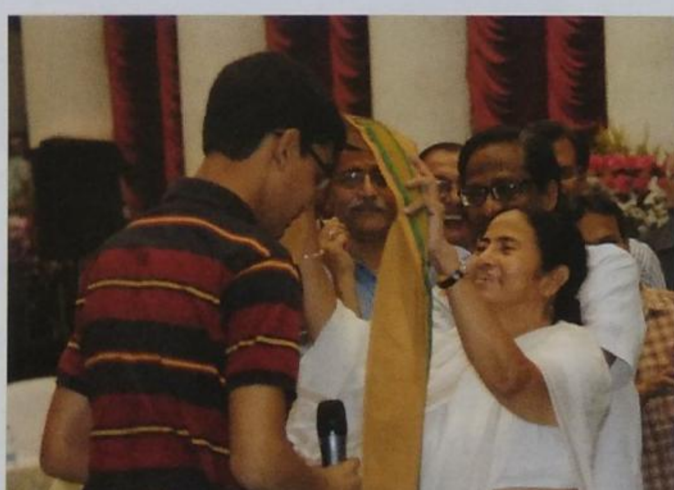

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

জীবনের লড়াইতে হার না মানার আদর্শ প্রতিবছরই এঁদের সামনে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। এঁরা রাজ্যের মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, উচ্চমাধ্যমিক, হাই মাদ্রাসা, আলিম, ফাজিল এবং দিল্লি বোর্ডের আই.সি. এস.ই, আই.এস.সি এবং সিবিএসই-র পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়া কৃতী ছাত্রছাত্রী। ২০১২ থেকে প্রতিবছর এভাবেই রাজ্যের ভবিষ্যৎ মানবসম্পদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন প্রশাসনিক প্রধান—সংবর্ধিত করেন তাঁদের। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা—জীবনে হতাশার স্থান নেই। আঘাত পেলে, মার খেলেও জীবনযুদ্ধে জয় করতেই হবে। মনের থাকবে অদম্য শক্তি। মাথা নীচু করে জীবনে বাঁচবে না। আর উচ্চশিক্ষা থেকে রাজ্যের কোনও ছাত্রছাত্রী যেন বঞ্চিত না হয়, তা দেখা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে সাফল্যের স্বীকৃতি পেয়ে প্রতিবছরই আপ্লুত ছাত্রছাত্রীরা। অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁদের সমস্যার কথাও জানাতে পেরে খুশি।০

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮। নদিয়ার মায়াপুরে ইসকনের মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী (উপরে)।
সেদিনই চাঁদ কাজির মাজার পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী (নীচে)।

৯ মার্চ, ২০১৮। গার্ডেনরিচে, কেএমডিএ-র উদ্যোগে নবনির্মিত উড়ালপুলের উদ্‌বোধনে মুখ্যমন্ত্রী।